শ্রেণির কাজ

শ্রেণির কাজগুলো প্রয়োগমূলক ও চিন্তনদক্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়ে থাকে। এগুলো থেকে সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কাজগুলো সম্পর্কে শ্রেণিশিক্ষক আলোচনা করবেন এবং ক্লাসে করে দেখাবেন, অথবা একক বা দলীয়ভাবে শিক্ষার্থীদের করতে বলবেন এবং রিপোর্ট আকারে জমা দিতে বলবেন। অধ্যায়ভিত্তিক কাজগুলোর সমাধান রিপোর্ট আকারে দেওয়া হয়েছে। এগুলোকে নমুনা হিসেবে অনুসরণ করো।

প্রথম অধ্যায় ▶ অর্থনীতি পরিচয়

কাজ: অর্থনীতির উৎপত্তি ও বিকাশ ধারাবাহিকভাবে লেখো।

◄ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ২

কাজের উদ্দেশ্য: কোনো একটি বিষয়ের উৎপত্তি ও এর বিকাশ কীভাবে সাধিত হয় সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা ধারণা লাভ করতে পারা।

কার্যপদ্ধতি: কোনো কিছুর উৎপত্তি ও বিকাশ জানার জন্যে শিক্ষার্থীরা এর প্রাথমিক অবস্থা জানবে। তারপর এর ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন অঞ্চল ও মনীষীদের মাধ্যমে কীভাবে বর্তমানরূপ লাভ করেছে তা বের করবে।

বিবরণ: আমরা আজকের দিনে যে অর্থনীতি পড়ি পূর্বে তা এতটা গোছালো ছিল না। তখন কায়িক শ্রম ছিল উৎপাদনের একমাত্র উপকরণ।

অর্থনৈতিক ধারণার সূত্রপাত ঘটে খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ বছর আগে.তথা হিব্রু সভ্যতার যুগে।

সত্যিকার অর্থে গ্রিসেই সর্বপ্রথম কিছুটা সংঘবদ্ধভাবে অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণার উন্মেষ ঘটে। গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটলকে প্রথম অর্থনীতিবিদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

অর্থনীতির ইংরেজি শব্দ Economics গ্রিক শব্দ Oikonomia থেকে এসেছে। Oikonomia অর্থ গৃহস্থালির ব্যবস্থাপনা। গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল অর্থনীতিকে গৃহস্থালির ব্যবস্থাপনা নামে অভিহিত করেন।

প্রাচীন ভারতে চতুর্থ খ্রিষ্টপূর্বে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' অর্থনীতি বিষয়ের ওপর সামান্য আলোচনা করা হয়। এর পর ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইতালিতে বিভিন্ন ধরনের মতবাদের জন্মের মাধ্যমে অর্থনৈতিক চিন্তা-ভাবনার প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এ প্রসঙ্গে ইংল্যান্ডের বণিকবাদ ও ফ্রান্সের ভূমিবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এভাবেই প্রাচীন ও মধ্যযুগে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে অর্থনীতি বিষয়ে আলোচনা হয়।

ফলাফল: অর্থনীতি একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি পায় যখন ইংরেজ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ ১৭৭৬ সালে তার বিখ্যাত বই 'An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations' রচনা করেন। এখনকার অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো অ্যাডাম স্মিথের এই বই।

দলগত কাজ: ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার তুলনা করে উপস্থাপন করো।

◄ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১১

কাজের উদ্দেশ্য: ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য জানা।

বিবরণ: ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মধ্যে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা	সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা
১. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত।	১. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানা স্বীকৃত।
২. এ অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্বাধীনতা বিদ্যমান।	২. এ অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্বাধীনতা নেই।
৩. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হচ্ছে মুনাফা অর্জন।	৩. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক কল্যাণসাধন।
৪. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় শ্রেণিশোষণ পরিলক্ষিত হয়।	৪. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা শোষণহীন অর্থব্যবস্থা।
৫. এ অর্থব্যবস্থায় ভোক্তার স্বাধীনতা স্বীকৃত।	৫. এ অর্থব্যবস্থায় ভোক্তার স্বাধীনতার অভাব রয়েছে।
৬. এ অর্থব্যবস্থায় সম্পদের বণ্টন সুষম নয়।	৬. এ অর্থব্যবস্থায় সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা হয়।
৭. এ অর্থব্যবস্থায় শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা হয় না।	৭. এ অর্থব্যবস্থায় শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় সতর্ক দৃষ্টি দেয়া হয়।
৮. অবাধ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান।	৮. অবাধ প্রতিযোগিতা নেই।
৯. বেকারত্ব বিদ্যমান থাকে।	৯. বেকারত্ব বিদ্যমান থাকে না।
১০. মুদ্রাস্ফীতি পরিলক্ষিত হয়।	১০. মুদ্রাস্ফীতি পরিলক্ষিত হয় না।

সমাজতন্ত্রে উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন, ভোগ প্রভৃতি যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় এসব কর্মকাণ্ড ব্যক্তিগত উদ্যোগে সাধিত হয়।

ফলাফল: ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করতে পারি।

কাজ: বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার সাথে কোন অর্থব্যবস্থার মিল রয়েছে? মতামত দাও।

◄ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২

কাজের উদ্দেশ্য: বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের সাথে যে অর্থব্যবস্থার মিল রয়েছে তা খুঁজে বের করা।

বিবরণ: যে অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রণ বিরাজ করে তাকে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে। বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রণ বিরাজ করে। তাই বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার সাথে মিশ্র অর্থব্যবস্থার মিল আছে।

এ অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

১. **ব্যক্তিগত মালিকানা:** বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থায় মিশ্র অর্থব্যবস্থার ন্যায় সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত।
২. **সরকারি বিনিয়োগ:** বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-কারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। যা মিশ্র অর্থব্যবস্থায়ও লক্ষ করা যায়।
৩. **বেসরকারি বিনিয়োগ:** বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্যবসা-বাণিজ্য, পেশা নির্বাচন ইত্যাদি স্বাধীনতা স্বীকৃত।
৪. **স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা:** বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থায় মিশ্র অর্থব্যবস্থার ন্যায় স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা বিদ্যমান।
৫. **সরকারি ও বেসরকারি খাতের সহাবস্থান:** বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতগুলো সহাবস্থান করে।
৬. **মুনাফার উপস্থিতি:** বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থায় বেসরকারি খাতে মুনাফার অস্তিত্ব স্বীকৃত হলেও সরকার জনস্বার্থে দাম ও মুনাফা নিয়ন্ত্রণের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ▶ অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ধারণাসমূহ

কাজ: অর্থনীতির ভাষায় নিচের কোনগুলো সম্পদ তা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও। গম, চাল, কবির প্রতিভা, কম্পিউটারের অভিজ্ঞতা, নদীর বালি।

◄ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৭

কাজের উদ্দেশ্য: কোনো জিনিসকে অর্থনীতিতে সম্পদ হতে হলে যেসব শর্ত পূরণ করতে হয় সেগুলো সম্পর্কে জানা।

কার্যপদ্ধতি: প্রদত্ত উপাদানগুলো শ্রেণিবিভাগ করে নেই। তারপর কোনটি কোন শ্রেণির সম্পদ তা আলাদা করি। এখন সম্পদের বৈশিষ্ট্যের আলোকে ব্যাখ্যা করি কোনটি সম্পদ আর কোনটি সম্পদ নয়।

বিবরণ: নিচে সম্পদের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে উক্ত বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করা হলো–

১. **গম ও চাল:** গম ও চালের উপযোগ আছে; চাহিদার তুলনায় এগুলোর জোগান সীমিত। এগুলোর বাহ্যিক অস্তিত্ব রয়েছে ও হস্তান্তরযোগ্য। এগুলোতে সম্পদের চারটি বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। তাই এগুলো সম্পদ।

২. **কবির প্রতিভা ও কম্পিউটারের অভিজ্ঞতা:** কবির প্রতিভা ও কম্পিউটারের অভিজ্ঞতার উপযোগ রয়েছে এবং এটা দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু মানুষের অন্তর্নিহিত গুণ বলে এগুলোর বাহ্যিকতা ও হস্তান্তরযোগ্যতা নেই। তাই বাহ্যিকতা ও হস্তান্তরযোগ্যতা নেই বলে এগুলো সম্পদ হিসেবে গণ্য হয় না।

৩. **নদীর বালি:** নদীর বালির উপযোগ, বাহ্যিকতা ও হস্তান্তরযোগ্যতা রয়েছে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় এর জোগান অনেক বেশি বলে এর অপ্রাচুর্যতা নেই। অতএব নদীর বালি সম্পদ নয়।

ফলাফল: কোনো জিনিসকে যদি অর্থনীতিতে সম্পদ বলতে হয় তবে তার চারটি বৈশিষ্ট্যই থাকা আবশ্যক।

কাজ: কোনটি কোন ধরনের দ্রব্য তা উল্লেখ করো– আলো, নদীর পানি, টেবিল, জমি, অলংকার, যন্ত্রপাতি। *◄ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ২২*

কাজের উদ্দেশ্য: দ্রব্যের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

কার্যপদ্ধতি: দ্রব্যগুলোকে বস্তুগত ও অবস্তুগতভাবে আলাদা করি। এরপর পাঠ্য বই এর আলোকে ব্যাখ্যা করি।

বিবরণ:

১. **আলো:** আলো হলো অবস্তুগত দ্রব্য; কারণ তা দেখা যায় না যদিও এর অস্তিত্ব রয়েছে।

২. **নদীর পানি:** নদীর পানি হলো অবাধলভ্য দ্রব্য; কারণ এর জোগান সীমাহীন এবং এর জন্যে মূল্য দিতে হয় না।

৩. **টেবিল:** টেবিল হলো অর্থনৈতিক দ্রব্য; কারণ এর জোগান সীমাবদ্ধ।

৪. **জমি:** জমি হলো স্থায়ী দ্রব্য; কারণ তা দীর্ঘকাল ভোগ করা যায়।

৫. **অলংকার:** অলংকার হলো অস্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য; কারণ তা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে পরা হয়।

৬. **যন্ত্রপাতি:** যন্ত্রপাতি হলো মূলধনী দ্রব; কারণ তা সরাসরি ভোগের কাজে না লেগে অধিক উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়।

ফলাফল: মানুষের অভাব মিটাবার ক্ষমতাসম্পন্ন এসব জিনিসকে আমরা বিভিন্ন ভাগে আলাদা করে দ্রব্যের শ্রেণিবিভাগ করে থাকি।

কাজ: বাস্তব জীবনের সুযোগ ব্যয়সংক্রান্ত দুটি উদাহরণ উল্লেখ করো। *◄ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ২৩*

কাজের উদ্দেশ্য: স্বল্প সম্পদ দ্বারা কীভাবে অনেক অভাব পূরণ করা যায় এজন্যে মানুষ নির্বাচনের সমস্যায় পড়ে। সুযোগ ব্যয় ধারণার দ্বারা এ ধরনের সমস্যা সমাধান করা যায়।

কার্যপদ্ধতি: ধরি, আমি যে সময়ে লেখাপড়া করতে চাই সেই সময়ে মাঠে ক্রিকেট খেলা দেখতে চাই। যদি এমন হয় তাহলে একজনের পক্ষে একই সাথে দুটি কাজ একই সময়ে করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সুযোগ ব্যয় ধারণার সাহায্যে আমি উভয় কাজের ফলাফল জানতে পারি।

বিবরণ: সুযোগ ব্যয় সংক্রান্ত উদাহরণ:

১. ধরা যাক, এক খণ্ড জমিতে ১০০ কেজি আলু কিংবা ৫০ কেজি টমেটো উৎপন্ন হতে পারে। কিন্তু ১০০ কেজি আলু উৎপাদন করতে গেলে ৫০ কেজি টমেটো উৎপাদনের সুযোগ হাতছাড়া করতে হয়। এক্ষেত্রে, ১০০ কেজি আলু উৎপাদনের সুযোগ ব্যয় হলো ৫০ কেজি টমেটো। রেখাচিত্রের সাহায্যে সুযোগ ব্যয়ের ধারণাটি প্রকাশ করা যায়।

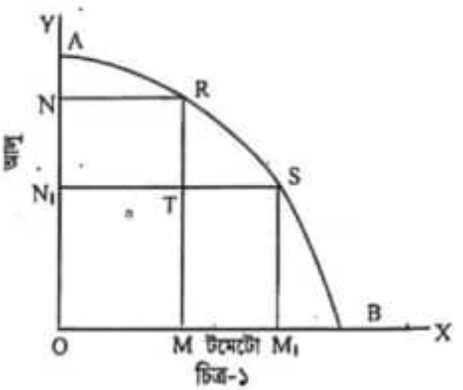

চিত্র-১

প্রদত্ত চিত্রে AB হলো সুযোগ ব্যয় রেখা বা উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা। চিত্রে দেখা যায়, AB রেখা বরাবর R থেকে S বিন্দুতে উপনীত হলে টমেটোর উৎপাদনের TS অর্থাৎ MM_1 পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য আলুর উৎপাদন RT অর্থাৎ NN_1 পরিমাণ ত্যাগ করতে হয়। এক্ষেত্রে MM_1 পরিমাণ টমেটো উৎপাদনের সুযোগ ব্যয় হলো NN_1 পরিমাণ আলু।

২. ধরা যাক, একজন দক্ষ শ্রমিক বেশি পরিশ্রম করে অধিক অর্থ উপার্জন করতে পারে; আবার কম পরিশ্রম করে অধিক বিশ্রাম নিতে পারে। যেমন– ধরা যাক, সে ৩ ঘণ্টা পরিশ্রম করে ১,০০০ টাকা আয় করতে পারে; এমনটি করলে তাকে ৩ ঘণ্টার বিশ্রাম ত্যাগ করতে হয়। এক্ষেত্রে, ১,০০০ টাকা অর্থ উপার্জনের সুযোগ ব্যয় হলো ৩ ঘণ্টার বিশ্রাম ত্যাগ। রেখাচিত্রের সাহায্যে সুযোগ ব্যয়ের এমন ধারণা প্রকাশ করা যায়।

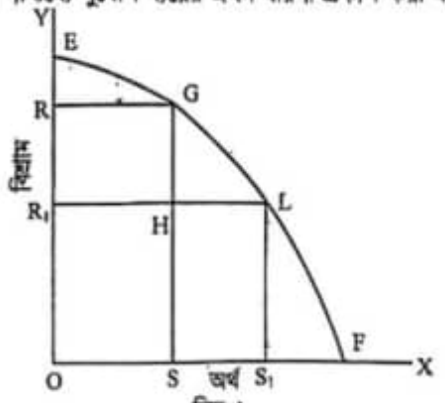

চিত্র-২

প্রদত্ত চিত্রে EF হলো সুযোগ ব্যয় বা উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা। চিত্রে দেখা যায়, EF রেখা বরাবর G থেকে L বিন্দুতে পৌঁছালে অর্থোপার্জন HL অর্থাৎ SS_1 পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য বিশ্রাম GH অর্থাৎ RR_1 পরিমাণ ত্যাগ করতে হয়। এক্ষেত্রে, SS_1 পরিমাণ অর্থোপার্জনের সুযোগ ব্যয় হলো RR_1 পরিমাণ বিশ্রাম।

ফলাফল: দুটি দ্রব্যের মধ্যে কোনটির উৎপাদন লাভজনক তা সুযোগ ব্যয়ের মাধ্যমে জানা যায়।

কাজ: বিনিয়োগ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনে এ রকম ৪টি ক্ষেত্র উল্লেখ করো। *◄ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ২৪*

কাজের উদ্দেশ্য: নতুন বিনিয়োগের ফলে অর্থনীতিতে যে সুফল পাওয়া যায় সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

কার্যপদ্ধতি: বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। এর ফলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে।

বিবরণ: বিনিয়োগ সমৃদ্ধি আনে এমন চারটি ক্ষেত্র নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. একটি প্লাস্টিকের কারখানা করতে গিয়ে ২৫ লক্ষ টাকা ধরা যাক, বিনিয়োগ করা হলো। এ কারখানাটি প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে অনেক লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। সেখানে উৎপাদিত দ্রব্য লোকের প্লাস্টিকের বাসনপত্রের চাহিদার অনেকটা পূরণ করবে।

২. ধরা যাক, একটি সার কারখানা করতে গিয়ে কোনো উদ্যোক্তা ১০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করলো। কারখানায় সার উৎপাদিত হলে তা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। ফলে কৃষি-নির্ভর শিল্পগুলো সস্তায় তাদের কাঁচামাল পাবে। সার আমদানিতে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় না করে তা অন্য কাজে ব্যয় করা যাবে।

৩. ধরা যাক, একটি সমবায় সমিতি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ট্রাক্টর কিনলো। ট্রাক্টর চালিত লাঙল গভীরভাবে ভূমি কর্ষণে সহায়ক হবে; কৃষি উপকরণসমূহ শস্যক্ষেত্রে নেওয়া ও সেখান থেকে উৎপাদিত পণ্য গুদামজাত করার জন্য ট্রাক্টর ব্যবহার করা যাবে। এসবের ফলে কৃষির উৎপাদন বাড়বে।

৪. ধরা যাক, একজন নাপিত ১ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে একটি সেলুন খুললো। সেখানে সে কয়েকজন লোককে কাজ দিল; সেখানে তার নিজেরও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হলো। সেলুনের কাজ দেশের সেবাকর্মের জোগানও বাড়াতে সাহায্য করলো।

ফলাফল: উপরিউক্ত উদাহরণের মাধ্যমে বলা যায়, বিনিয়োগ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনে।

কাজ: বাংলাদেশের মানুষের কৃষিসংক্রান্ত এবং কৃষিবহির্ভূত ১০টি করে অর্থনৈতিক কাজের একটি তালিকা তৈরি করো। ◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ২৫

কাজের উদ্দেশ্য: কৃষিসংক্রান্ত এবং কৃষিবহির্ভূত অর্থনৈতিক কাজ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

কার্যপদ্ধতি: তালিকা তৈরি করার পূর্বে বাংলাদেশের মানুষের কৃষিসংক্রান্ত কাজগুলো জানার জন্যে মাঠ পরিদর্শন করি। তারপর সেগুলো খাতায় একে একে লিখি।

বিবরণ: বাংলাদেশের মানুষের কৃষিসংক্রান্ত এবং কৃষিবহির্ভূত ১০টি করে অর্থনৈতিক কাজের তালিকা নিচে তৈরি করা হলো:

কৃষিসংক্রান্ত কাজ	কৃষিবহির্ভূত কাজ
১. জমি চাষ ২. বীজ বপন ৩. পানি সেচ ৪. সার দেওয়া ৫. কীটনাশক ছিটানো ৬. আগাছা নিড়ানো ৭. ফসল কাটা ৮. ফসল মাড়াই ৯. কৃষিপণ্য বাজারজাত করা ১০. কৃষি উপকরণসমূহ শস্যক্ষেত্রে নেওয়া ইত্যাদি।	১ কুটির শিল্পে কাজ ২. বড় কল-কারখানায় কাজ ৩. সরকারি অফিস-আদালতে কাজ ৪. যানবাহন চালানো ৫. মুদিখানায় দোকানদারি করা ৬. মিষ্টি বানানো ৭. স্বর্ণালংকার তৈরি ৮. মাটির বাসনপত্র বানানো ৯. কবিরাজী ১০. কাঁসা-পিতলের বাসন বানানো ইত্যাদি।

ফলাফল: উপরিউক্ত তালিকার মাধ্যমে সহজেই মানুষের জীবিকা নির্বাহের ধরন সম্পর্কে জানতে পারব।

শ্রেণির কাজ

তৃতীয় অধ্যায় ▶ উপযোগ, চাহিদা, জোগান ও ভারসাম্য

কাজ: উপযোগ ও ভোগ্য পণ্যের মধ্যে পার্থক্য উদাহরণ দ্বারা দেখাও। ◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৩০

কাজের উদ্দেশ্য: উপযোগ ও ভোগ্য পণ্যের মধ্যে সম্পর্ক ও পার্থক্য নির্ণয় করতে পারা।

কার্যপদ্ধতি: ধরি খাদ্য, বস্ত্র, বইপত্র, ডাক্তারের সেবা প্রভৃতি দ্রব্য মানুষের অভাব মেটায়। অন্যদিকে প্রতিদিন আমরা ভাত, মাছ, কলম, ঘড়ি, জামা-কাপড় ব্যবহার করি বা এগুলো আমরা ভোগ করি। অর্থনীতিতে মানুষের অভাব পূরণের জন্য কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাকে ভোগ বলা হয়।

বিবরণ: অর্থনীতিতে উপযোগ বলতে কোনো দ্রব্যের মানুষের অভাব পূরণের ক্ষমতাকে বোঝানো হয়। উপযোগ একটি মানসিক ধারণা। অন্যদিকে ব অর্থনীতিতে মানুষের অভাব পূরণের জন্য কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাকে ভোগ বলা হয়।

ফলাফল: উপযোগ ও ভোগ্য পণ্যের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে।

কাজ: মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে চারটি পার্থক্য লেখো। ◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৩১

কাজের উদ্দেশ্য: মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক ও পার্থক্য নির্ণয় করতে পারা।

কার্যপদ্ধতি: ধরি, ৪টি আম ক্রয় করা হলো। ১ম আমটি ৮ টাকা, ২য় টি ৭ টাকা, ৩য় টি ৬ টাকা এবং ৪র্থ আমের জন্যে ৫ টাকা দিতে চাই। এবার সবগুলো যোগ করি। অন্যদিকে, আম থেকে কত উপযোগ হলো তার হিসাব বের করি। এখান থেকে পার্থক্য লিখি।

বিবরণ: মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে চারটি পার্থক্য নিম্নরূপ:

১. মোট উপযোগ হলো ভোগকৃত সকল এককের উপযোগের সমষ্টি। আর প্রান্তিক উপযোগ হলো অতিরিক্ত এক একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগ। তাই প্রান্তিক উপযোগ হলো মোট উপযোগের একটি অংশ মাত্র।

২. দ্রব্যের ভোগ বাড়লে মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে; কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমে।

৩. প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হওয়া পর্যন্ত মোট উপযোগ বাড়তে থাকে।

৪. মোট উপযোগ সর্বাধিক হলে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়।

ফলাফল: মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ এর মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে।

কাজ: চাহিদাসূচি ও চাহিদারেখার মধ্যে ৩টি পার্থক্য উল্লেখ করো। ◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৩৫

কাজের উদ্দেশ্য: চাহিদাসূচি ও চাহিদারেখার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারা।

কার্যপদ্ধতি: এর জন্যে একটি সূচি লাগবে এবং সূচি থেকে চাহিদারেখা নির্ণয়ের পদ্ধতি জানা।

বিবরণ: চাহিদাসূচি ও চাহিদারেখার মধ্যে ৩টি পার্থক্য নিম্নরূপ:

১. চাহিদাসূচি হলো এমন একটি তালিকা যেখানে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন দামে ক্রেতার চাহিদার বিভিন্ন পরিমাণ গাণিতিক সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয়। পক্ষান্তরে, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে কোনো দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ যখন রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে চাহিদারেখা বলে।

২. চাহিদাসূচি হলো চাহিদাবিধির গাণিতিক রূপ; অপরপক্ষে চাহিদারেখা হলো চাহিদাবিধির জ্যামিতিক রূপ।

৩. চাহিদা সূচিতে বামদিকে দ্রব্যের দাম ও ডানদিকে চাহিদার পরিমাণ নির্দেশিত হয়। কিন্তু চাহিদারেখাতে সাধারণত ভূমি অক্ষে চাহিদার পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দাম নির্দেশিত হয়।

ফলাফল: চাহিদা সূচি ও চাহিদারেখার মধ্যে তেমন কোনো মৌলিক পার্থক্য হয় না। চাহিদা সূচি ও চাহিদারেখা হলো চাহিদা ও দামের সম্পর্ক অবকাশের দুটি ভিন্ন পদ্ধতি।

কাজ: জোগানসূচি ও জোগান রেখার মধ্যে ৩টি পার্থক্য উল্লেখ করো। ◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৩৯

কাজের উদ্দেশ্য: জোগানসূচি ও জোগান রেখার মধ্যে সম্পর্ক ও পার্থক্য নির্ণয় করতে পারা।

কার্যপদ্ধতি: এর জন্যে একটি সূচি লাগবে এবং সূচি থেকে জোগান রেখা নির্ণয়ের পদ্ধতি জানা।

বিবরণ: জোগানসূচি ও জোগান রেখার মধ্যে ৩টি পার্থক্য নিম্নরূপ:

১. জোগানসূচি হলো এমন একটি তালিকা যেখানে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন দামে বিক্রেতার জোগানের বিভিন্ন পরিমাণ গাণিতিক সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অন্যদিকে, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে কোনো দ্রব্যের জোগানের বিভিন্ন পরিমাণ যখন রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে জোগান রেখা বলে।

২. জোগানসূচি হলো জোগানবিধির গাণিতিক রূপ। অপরপক্ষে, জোগান রেখা হলো জোগানবিধির জ্যামিতিক রূপ।

৩. জোগানসূচিতে বামদিকে দ্রব্যের দাম ও ডানদিকে জোগানের পরিমাণ নির্দেশিত হয়। কিন্তু জোগান রেখাতে সাধারণত ভূমি অক্ষে জোগানের পরিমাণ এবং এর লম্ব অক্ষে দাম নির্দেশিত হয়।

ফলাফল: জোগানসূচি ও জোগান রেখা একই তথ্য প্রকাশের দুইটি ভিন্ন মাধ্যম। জোগানের সাথে দামের সরাসরি সম্পর্ক থাকায় জোগান রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়।

কাজ: পোস্টার কাগজে ভারসাম্য দাম নির্ধারণের চিত্রটি শ্রেণিতে উপস্থাপন করো। ◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৪০

কাজের উদ্দেশ্য: ভারসাম্য বিন্দুতে কেন দাম নড়াচড়া করে না সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

বিবরণ: ভারসাম্য বিন্দুতে কেন দাম নড়াচড়া করে না। নিচে দাম নির্ধারণের চিত্রটি দেখানো হলো:

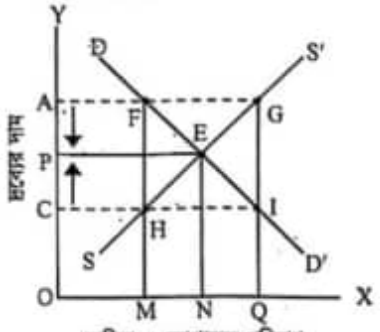

চিত্র: ভারসাম্য দাম নির্ধারণ

১. ভারসাম্য বিন্দুতে চাহিদা ও জোগান সমান হয়। চাহিদা জোগান থেকে বেশি না হওয়ায় দাম নিম্নমুখী হয় না। আবার চাহিদা জোগান থেকে কম না হওয়ায় দাম উর্ধ্বগামীও হয় না। এজন্য দাম নড়াচড়া করে না।
২. ভারসাম্য বিন্দুতে জোগান ও চাহিদা সমান হয়। জোগান চাহিদা থেকে বেশি না হওয়ায় দাম নিম্নমুখী হয় না। আবার জোগান চাহিদা থেকে কম না হওয়ায় দাম উর্ধ্বমুখীও হয় না। এজন্য দাম নড়াচড়া করে না।

ফলাফল: বাজার অর্থনীতিতে তথা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থায় চাহিদা ও জোগানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বাজার ভারসাম্য নির্ধারিত হয়।

চতুর্থ অধ্যায় ▶ উৎপাদন ও সংগঠন

কাজ: নিচের পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে উৎপাদনের মাধ্যমে সৃষ্ট উপযোগের প্রকারভেদ অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস করো। ◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৪৫

কাজের উদ্দেশ্য: উৎপাদনের প্রকারভেদ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

বিবরণ: নিচের পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে উৎপাদনের মাধ্যমে সৃষ্ট উপযোগের প্রকারভেদ অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস করা হলো—

উৎপাদনের প্রকারভেদ	পরিবর্তিত পরিস্থিতি
রূপগত উপযোগ সৃষ্টি	ধান থেকে চাল, চাল থেকে পিঠা, গম থেকে আটা, আখ থেকে চিনি, লোহা পিটিয়ে যন্ত্রপাতি তৈরি, মাছের পুকুর
স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি	গ্রামের কলা, ফলমূল, সবজি শহরে স্থানান্তর
সময় বা কালগত উপযোগ সৃষ্টি	অগ্রাহয়ণ মাসের আলু আষাঢ় মাসে বিক্রি
সেবাগত উপযোগ সৃষ্টি	সৈনিকের কাজ
উৎপাদন নয়	পিতামাতার আদর-স্নেহ

ফলাফল: কোন উপযোগ কোন ধরনের উৎপাদন সৃষ্টি করে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া।

কাজ: রমজান আলী একজন মালিক, উৎপাদক না সংগঠক তা উল্লেখ করো। ◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৪৫

কাজের উদ্দেশ্য: কখন একজন ব্যক্তিকে মালিক, উৎপাদক আর কখন একজন ব্যক্তিকে সংগঠক বলা যায় সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

কার্যপদ্ধতি: একজন কৃষক যিনি ফসল উৎপাদন করেন আবার একজন ম্যানেজার যিনি উৎপাদন কার্য পরিচালনা করেন। তাদের কাজের প্রকৃতি বিশ্লেষণ।

বিবরণ: রমজান আলীকে একজন মালিক, উৎপাদক না সংগঠক বলা যায় তা নিম্নরূপভাবে বিবেচনা করা হলো—
রমজান আলীর নিজের কৃষিজমি রয়েছে এবং তিনি নিজেই এই জমিতে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করেন। এ কারণে তাকে মালিক বলা যায়। আবার, তাকে একজন সংগঠক না বলে উৎপাদক বলা যায়; কারণ তিনি উৎপাদনের এমন কাজের সাথে জড়িত যার সাথে সংগঠকের চেয়ে উৎপাদকের কাজের মিল বেশি। উৎপাদক হিসেবে তার কাজগুলো নিম্নরূপ:
১. জমি চাষ ২. বীজ বপন ৩. জমিতে সার প্রয়োগ ৪. কীটনাশক ছিটানো ৫. শস্য গাছ পরিচর্যা ৬. ফসল কর্তন ৭. ফসল মাড়ানো ৮. ফসল সংরক্ষণ ৯. ফসল বাজারজাতকরণ ১০. মুনাফা আহরণ ইত্যাদি।

ফলাফল: উল্লিখিত কাজগুলোর বেশির ভাগই একজন উৎপাদক সম্পাদন করেন, সংগঠক নয়। এজন্য রমজান আলীকে একজন সংগঠক না বলে উৎপাদক এবং মালিক বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

কাজ: দেশের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনের উপকরণসমূহ কী কী হতে পারে? ◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৪৭

কাজের উদ্দেশ্য: কোন দেশ কোন ধরনের উৎপাদনের উপকরণ তৈরি করে সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

কার্যপদ্ধতি: বাংলাদেশ কোন শ্রেণির দেশ আবার জাপান কোন শ্রেণির দেশ তা লক্ষ করি।

বিবরণ: দেশের প্রেক্ষিতে উৎপাদনের উপকরণসমূহ বিভিন্ন রকম হয়। নিচে তা উল্লেখ করা হলো—

দেশের নাম	উৎপাদনে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণসমূহ
বাংলাদেশ, কৃষিনির্ভর দেশ	কাঠের লাঙল, ট্রাক্টর চালিত লাঙল, পাওয়ার টিলার, সেচ যন্ত্রপাতি, স্প্রে মেশিন, শস্য মাড়াই যন্ত্র, বীজ, সার, কীটনাশক, কৃষিকাজে ব্যবহৃত গবাদি পশু, গরুর গাড়ি, বস্তা, দড়ি ইত্যাদি।
জাপান, শিল্পনির্ভর দেশ	আকরিক লোহা, খনিজ তেল, লোহা, স্টিল, লোহার রড, গন্ধক, সিলিকা বালু, তামা, কাচ, পার্টেক্স জাতীয় দ্রব্য, শিল্পের কাঁচামাল ইত্যাদি।

ফলাফল: কৃষিপ্রধান দেশ কৃষিজাত দ্রব্য বেশি উৎপাদন করে। অন্যদিকে, শিল্পপ্রধান দেশ শিল্পজাত দ্রব্য বেশি উৎপাদন করে।

কাজ: উৎপাদন খাতে অধিক গুরুত্ব অনুযায়ী উপকরণগুলো সাজাও। ◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৪৭

কাজের উদ্দেশ্য: উৎপাদনের সকল উপাদান সমান গুরুত্ব সম্পন্ন নয়। উৎপাদনের উপাদানের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

কার্যপদ্ধতি: বিভিন্ন ধরনের উপাদান এলোমেলো করে নেই। তরপর গুরুত্ব অনুযায়ী সাজাই।

বিবরণ: উৎপাদনে অধিক গুরুত্ব অনুযায়ী উপকরণগুলো নিম্নরূপে সাজানো হলো—

উৎপাদন খাত	অধিক গুরুত্বের ভিত্তিতে উপকরণগুলো হচ্ছে
কৃষি	জমি, গবাদি পশু, লাঙল, পানি সেচ, বীজ, সার, কীটনাশক, স্প্রে মেশিন, গরুর গাড়ি, মাড়াই যন্ত্র, গুদাম ঘর ইত্যাদি।
শিল্প	জমি, শ্রমিক, কারখানা ঘর, যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, রাসায়নিক পদার্থসমূহ, কাঁচামাল, ট্রাক, গুদামঘর ইত্যাদি।

কাজ: সাংগঠনিক কাজের একটি তালিকা তৈরি করো। ◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৪৯

কাজের উদ্দেশ্য: সাংগঠনিক কাজের ধরন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

বিবরণ: সাংগঠনিক কাজের তালিকা নিম্নরূপ তৈরি করা হলো:
১. কারবার গঠনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন।
২. কারবারের নীতি নির্ধারণ।
৩. উৎপাদনের উপকরণসমূহ সংগ্রহ ও তাদের মধ্যে সমন্বয়-সাধন।
৪. কাজের ধরন ও উদ্দেশ্যের মিল অনুযায়ী কারবারের কাজগুলোর বিভাজন।
৫. অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুযায়ী কর্মচারীদের মধ্যে কাজ বণ্টন।
৬. কাজের কর্তৃত্ব ও দায়ভার অর্পণ।
৭. উপাদানগুলোর পারিশ্রমিক প্রদান।
৮. কারবারের সার্বিক ঝুঁকি বহন।
৯. নতুনত্ব প্রবর্তন।
১০. দ্রব্য বাজারজাত করা।
১১. মুনাফা লাভ করা ইত্যাদি।

ফলাফল: একজন সংগঠক যেসব কাজ করে সে সম্পর্কে বলতে পারা।

কাজ: একটি উৎপাদনী প্রতিষ্ঠানের প্রকাশ্য ও অ-প্রকাশ্য ব্যয়ের ধারণা জানা কেন গুরুত্বপূর্ণ? দলগতভাবে আলোচনা করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করো। *◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৩*

কাজের উদ্দেশ্য: একটি উৎপাদনী প্রতিষ্ঠানের প্রকাশ্য ও অ-প্রকাশ্য ব্যয়ের সম্পর্কে জানা।

কার্যপদ্ধতি: বিভিন্ন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে ঘুরে ঘুরে প্রকাশ্য ও অ প্রকাশ্য ব্যয়গুলো জেনে নেই।

বিবরণ: কোনো উৎপাদনের প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় পরিমাপ করতে হলে প্রকাশ্য ও অ-প্রকাশ্য, এই দুই ধরনের ব্যয়কেই বিবেচনায় আনতে হয়। নিচে একটি বিস্কুট কারখানার প্রকাশ্য ও অ-প্রকাশ্য ব্যয়গুলোর তালিকা তৈরি করে দলগতভাবে আলোচনার পর শ্রেণিতে উপস্থাপন করা হলো—

প্রকাশ্য ব্যয়ের তালিকা	অ প্রকাশ্য ব্যয়ের তালিকা
১. কারখানা ঘরের ভাড়া ২. স্থায়ী কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ৩. অস্থায়ী শ্রমিকদের মজুরি ৪. গৃহীত ঋণের সুদ ৫. বিমার প্রিমিয়াম, ৬. বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্যে ব্যয় ৭. জ্বালানি কাঠের জন্যে ব্যয় ৮. ময়দা, চিনি, ইস্ট, রং ইত্যাদি ৯. ভ্যান ও মিনি ট্রাক পরিচালনার ব্যয় ১০. বিস্কুট প্যাকেট বানানোর ব্যয় ইত্যাদি।	১. উদ্যোক্তার নিজের শ্রমের মূল্য ২. উদ্যোক্তার নিজের বাড়িতে কারখানা ও অফিস স্থাপনের ব্যয় ৩. কারখানার বিভিন্ন কাজের জন্যে মালিকের ভাতাদি গ্রহণ ইত্যাদি।

ফলাফল: একটি প্রতিষ্ঠানে দুই ধরনের ব্যয় থাকে। তা সহজে জানা যায়।

পঞ্চম অধ্যায় ▶ বাজার

কাজ: বাজারের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করো। *◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৮*

কাজের উদ্দেশ্য: বাজারের উপাদান বা বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

বিবরণ: অর্থনীতিতে বাজার বলতে নির্দিষ্ট কোনো পণ্যদ্রব্যকে বোঝায়, যা ক্রেতা ও বিক্রেতার দরকষাকষির মাধ্যমে নির্ধারিত মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় হয়। বাজারের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে বাজারের নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় উপাদান বা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়—

১. ক্রয়বিক্রয়যোগ্য একটি বা একাধিক দ্রব্য।
২. দ্রব্যটির একদল ক্রেতা ও বিক্রেতা।
৩. দ্রব্যটির ক্রয়বিক্রয়ের এক বা একাধিক অঞ্চল।
৪. ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট দামের উদ্ভব।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে বলা যায় নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দামে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দর কষাকষির মাধ্যমে কোনো দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়কে বাজার বলে।

কাজ: প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারব্যবস্থার একটি চার্ট তৈরি করো। *◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৫৯*

কাজের উদ্দেশ্য: বাজারের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

বিবরণ: প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে নিচে বাজার ব্যবস্থার একটি চার্ট তৈরি করা হলো—

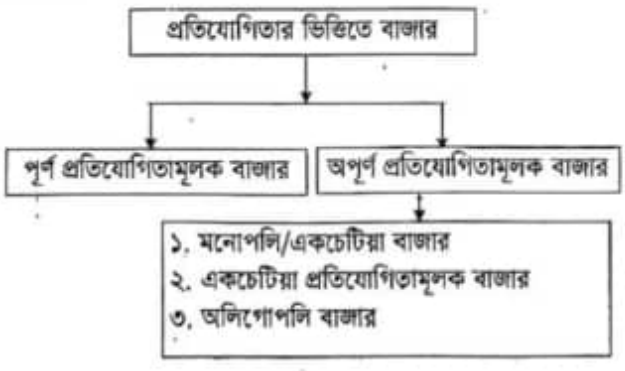

কাজ: পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ও একচেটিয়া বাজারের তুলনা করো। *◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬২*

কাজের উদ্দেশ্য: পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ও একচেটিয়া বাজারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারা।

বিবরণ:

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার	একচেটিয়া বাজার
১. অসংখ্য ক্রেতা বিক্রেতা বিদ্যমান।	অসংখ্য ক্রেতা কিন্তু একজন মাত্র বিক্রেতা বিদ্যমান।
২. সমজাতীয় পণ্য বিদ্যমান।	একটিমাত্র পণ্য কিন্তু এটির পূর্ণ বিকল্প পণ্য নাই।
৩. বাজারে নতুন প্রতিযোগীর অবাধ প্রবেশাধিকার রয়েছে।	নতুন প্রতিযোগীর প্রবেশ পথ রুদ্ধ।
৪. উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে বা ফার্মে, দ্রব্যটির চাহিদারেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল।	উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে বা ফার্মে দ্রব্যটির চাহিদারেখা নিম্নগামী।

ফলাফল: পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ও একচেটিয়া বাজারের মধ্যে পার্থক্য জানতে পারি।

কাজ: একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ৫টি বৈশিষ্ট্য লেখো। *◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৪*

কাজের উদ্দেশ্য: একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ৫টি বৈশিষ্ট্য জানতে পারা।

বিবরণ:

১. **ফার্ম/বিক্রেতার সংখ্যা:** একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় ফার্মের সংখ্যা অসংখ্য। এক একটি ফার্ম বাজারে মোট উৎপাদনের একটি সামান্য অংশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
২. **উৎপাদিত দ্রব্যের পৃথকীকরণ:** একচেটিয়া প্রতিযোগিতার অধীনে বিভিন্ন ফার্ম যেসব পণ্য উৎপাদন করে সেগুলো অনেকটা সদৃশ হলেও একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করা সম্ভব।
৩. **শিল্পে ফার্মের অবাধ প্রবেশ ও প্রস্থান:** একচেটিয়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কোনো ফার্মের শিল্পে প্রবেশ এবং প্রস্থানে কোনো বাধা নিষেধ নেই।
৪. **বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় খরচ:** প্রত্যেকটি ফার্ম তার পণ্যের বিক্রি বাড়াতে বেশি প্রচার করে। প্রচার ও দ্রব্যের গুণগতমানের মাধ্যমে এই ফার্মগুলো পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।
৬. **মুনাফা সর্বোচ্চকরণ:** একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে প্রত্যেক বিক্রেতার লক্ষ্য থাকে মুনাফার পরিমাণ সর্বাধিক করা।

কাজ: অলিগোপলি বাজারের ৩টি বৈশিষ্ট্য লেখো। *◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৫*

কাজের উদ্দেশ্য: অলিগোপলি বাজারের ৫টি বৈশিষ্ট্য জানতে পারা।

বিবরণ: যে বাজারে কতিপয় বিক্রেতা ও অনেক ক্রেতা সমজাতীয় বা প্রায় সমজাতীয় দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করে, তাকে অলিগোপলি বাজার বলে। এ বাজারের ৩টি বৈশিষ্ট্য হলো-

১. **বিক্রেতার সংখ্যা:** এ ধরনের দ্রব্যের বাজারে কতিপয় বিক্রেতা থাকে।
২. **দ্রব্যের প্রকৃতি:** এ ধরনের দ্রব্যের বাজারে সমজাতীয় অর্থাৎ একই ধরনের বা প্রায় সমজাতীয় বা সামান্য পৃথকীকরণ করা যায়।
৩. **সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** এ ধরনের দ্রব্যের বাজারের একটি ফার্ম তার দ্রব্যের দাম ও উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্মের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

কাজ: নিম্নলিখিত পণ্যগুলো স্থানভেদে কোন ধরনের বাজার তা উল্লেখ করে যুক্তি দাও। *◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৬৬*

কাজের উদ্দেশ্য: পণ্যগুলো স্থানভেদে কোন ধরনের বাজার তা জানতে পারা।

বিবরণ: পণ্যের নামের তালিকা:

পণ্যের নাম	বাজারের নাম ও যুক্তি
ক. আম	জাতীয় বাজার (দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ)
খ. কাঁঠাল	জাতীয় বাজার (দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ)
গ. তরিতরকারি	স্থানীয় বাজার (নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ)

পণ্যের নাম	বাজারের নাম ও যুক্তি
ঘ. মাছ	স্থানীয় বাজার (নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ)
ঙ. তাঁত কাপড়	আন্তর্জাতিক বাজার (দেশের এবং বিদেশেও বিস্তৃত)
চ. চা	আন্তর্জাতিক বাজার (দেশের এবং বিদেশেও বিস্তৃত)
ছ. পেয়ারা, কলা, বরই	জাতীয় বাজার (দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ)
জ. নারিকেল	জাতীয় বাজার (দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ)
ঝ. গো-দুধ	স্থানীয় বাজার (নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ)
ঞ. মাংস	স্থানীয় বাজার (নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ)

ফলাফল: পণ্যগুলো স্থানভেদে কোনটি কী ধরনের বাজার তা সম্পর্ক জানতে পারব।

ষষ্ঠ অধ্যায় ▶ জাতীয় আয় ও এর পরিমাপ

কাজ: GNI, GDP, CCA – এদের পূর্ণরূপ দাও। ◀ *কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭২*

কাজের উদ্দেশ্য: সাংকেতিক শব্দের পূর্ণ নাম জানতে পারা।

বিবরণ: GNI, GDP, CCA এদের পূর্ণরূপ নিম্নরূপ:

GNI : Gross National Income
GDP : Gross Domestic Product
CCA : Capital Consumption Allowance

কাজ: CCA (Capital Consumption Allowance) আসলে কী? ◀ *কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭২*

কাজের উদ্দেশ্য: সংজ্ঞা সম্পর্কে ধারণা লাভ।

বিবরণ: Capital Consumption Allowance বলতে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বোঝায়। একটি দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে উৎপাদনের সময় মূলধনী যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি হয়। এজন্য বছরের শুরুতে এগুলোর যা মূল্য থাকে, বছরের শেষে তা থাকে না। মূলধনী যন্ত্রপাতির সঠিক মূল্য নির্ধারণের জন্য এর ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় মূলধনী যন্ত্রপাতির মূল্য থেকে বাদ দেয়া হয়। সুতরাং মূলধনী যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে দেয়ার জন্য যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয় তাকেই মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বলে।

কাজ: মোট দেশজ উৎপাদনে গণনা করা হয় না, এমন সব দ্রব্য ও বিষয়ের একটি তালিকা প্রস্তুত করো। ◀ *কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৫*

কাজের উদ্দেশ্য: যে সব দ্রব্য ও সেবা মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) এ গণনা করা হয় না সেগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

বিবরণ: মোট দেশজ উৎপাদন গণনার সময় যেসব দ্রব্য ও বিষয় গণনা করা হয় না তার একটি তালিকা নিচে প্রস্তুত করা হলো:

১. **মাধ্যমিক দ্রব্য ও সেবা:** চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার ভেতরেই মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার মূল্য অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই জিডিপি গণনার সময়ে চূড়ান্ত দ্রব্যের পরে আবার মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা বিবেচনা করলে জাতীয় আয় গণনার ক্ষেত্রে দ্বৈত গণনা সমস্যা দেখা দেয়। এজন্য মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা জিডিপি গণনার সময় বিবেচনা করা হয় না।

২. **বিনামূল্যে প্রাপ্ত দ্রব্য ও সেবা:** অর্থনীতিতে এমন কিছু দ্রব্য ও সেবা রয়েছে যেগুলো অর্থের বিনিময়ে বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে বেচা-কেনা হয় না; যেমন- মা কর্তৃক সন্তানের লালন-পালন, বাড়িতে গৃহিনীর রান্না-বান্না ইত্যাদি। জিডিপি গণনার সময় এ জাতীয় সেবার মূল্য গণনা করা হয় না।

৩. **অতীতে উৎপাদিত পণ্য:** যে বছরের জিডিপি গণনা করা হয়, তার পূর্বের কোনো বছরের উৎপাদিত পণ্য ঐ আলোচ্য বছরের জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয় না। যেমন- পুরাতন টেলিভিশন, পুরাতন বাড়ি ইত্যাদি। এসব পণ্য যে বছর উৎপাদিত হয়েছে ঐ বছরের জিডিপি এর মধ্যে এসবের মূল্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি আবার গণনা করলে দ্বৈত গণনা সমস্যা দেখা দেয়।

৪. **মূলধনী লাভ-ক্ষতি:** সময়ের ব্যবধানে সম্পদের মূল্য পরিবর্তনজনিত লাভ বা ক্ষতি জিডিপি গণনার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে না। কারণ, এ লাভ-ক্ষতি শুধু কাগজ-কলমে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে লেখা হয়। যে প্রতিষ্ঠানের যতটুকু লাভ হয় অন্য প্রতিষ্ঠানের এর সমপরিমাণ ক্ষতি হয়; বিধায় জিডিপি গণনায় লাভ-ক্ষতির প্রভাব শূন্য হয়।

৫. **সরকারি ঋণের সুদ:** সরকারি ঋণ একটি হস্তান্তর পাওনা হিসেবে বিবেচ্য হয়; তাছাড়া এটি জাতীয় উৎপাদনেও কোনো ভূমিকা রাখে না। এজন্য তা জিডিপি থেকে বাদ দেয়া হয়।

৬. **বেআইনি কাজ:** বেআইনি কাজ যেমন— জুয়াখেলা, ঘুষ ইত্যাদি সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয় এবং বেআইনিও বটে। এজাতীয় কাজ তাই জিডিপিতে ধরা হয় না।

ফলাফল: বাংলাদেশে জাতীয় আয় গণনার দায়িত্বে নিয়োজিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। পরিসংখ্যান ব্যুরো চলতি বাজার মূল্য ও স্থির মূল্য পরিমাপ করে GDP ও GNP গণনা করে থাকে।

সপ্তম অধ্যায় ▶ অর্থ ও ব্যাংকব্যবস্থা

কাজ-১: অর্থের প্রকারভেদের ছক তৈরি করো। ◀ *কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৩*

কাজের উদ্দেশ্য: ছক তৈরির কৌশল সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

বিবরণ: অর্থের প্রকারভেদের ছক নিম্নরূপ তৈরি করা হলো:

ফলাফল: কোনো বিষয়ের শ্রেণিবিভাগ ছকের মাধ্যমে সহজেই স্পষ্ট করে তোলা যায়।

কাজ: অর্থ আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সহজতর করেছে— ব্যাখ্যা করো। ◀ *কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৫*

কাজের উদ্দেশ্য: অর্থের ব্যবহার আমাদের দৈনিন্দন জীবনকে গতিশীল করেছে।

বিবরণ: অর্থ আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সহজতর করেছে। নিচে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো:

১. বিনিময়ের মাধ্যমে হিসেবে অর্থ সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। এজন্য অর্থ প্রচলনের ফলে বিনিময়ের কাজ সহজ ও সুবিধাজনক হয়েছে।

২. অর্থ দ্বারা যেকোনো দ্রব্য, সেবা বা সম্পদের মূল্য পরিমাপ করা যায়। মূল্য পরিমাপের এ ধরনের সাধারণ পরিমাপকের সাহায্যে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের লেনদেনের হিসাব রাখতে এবং দ্রব্য ও সেবার আদান-প্রদান করতে সুবিধা হয়।

৩. অর্থ ব্যবহারের ফলে ঋণদাতা অর্থের অঙ্কে ঋণ দেয় এবং ঋণগ্রহীতা অর্থের অংকে তা পরিশোধ করে। অর্থের মূল্য স্বল্পকালে খুব একটা পরিবর্তিত হয় না বলে অর্থের মাধ্যমে দেনা-পাওনার হিসাব করলে কারো ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না।

৪. দ্রব্য সঞ্চয়ের পরিবর্তে তার মূল্য হিসেবে অর্থ সঞ্চয় করা যায়। এটি বেশ নিরাপদ ও সুবিধাজনক।

৫. ব্যাংকে রক্ষিত নগদ অর্থের ভিত্তিতে ঋণ সৃষ্টি করা যায়। তাই অর্থের সাহায্যে প্রয়োজনীয় ঋণ সহজেই পাওয়া যায়।

৬. মূল্য স্থানান্তরের মাধ্যমে অর্থ সম্পদ ব্যবহার ও আর্থিক লেনদেনে সাহায্য করে।

৭. অর্থ সবচেয়ে তরল সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। অর্থের এ তারল্য গুণের জন্য যেকোনো দ্রব্যের মূল্য সহজেই অর্থে রূপান্তর করা যায়।

ফলাফল: আধুনিক অর্থনীতিতে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থ সর্বজন স্বীকৃত ও গৃহীত।

কাজ: বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে? ব্যাখ্যা করো। ◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৮

কাজের উদ্দেশ্য: বাণিজ্যিক ব্যাংকের কর্মকাণ্ড অর্থনীতিতে যে অবদান রাখছে সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

বিবরণ: বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্নভাবে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো:

১. বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানত হিসেবে গৃহীত অর্থের ওপর সুদ প্রদান করে জনসাধারণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে। সঞ্চয় বাড়ানো দেশে মূলধন গঠন সহজ হয়। মূলধন উন্নয়নের চালিকাশক্তি।

২. বিভিন্ন প্রকার ব্যবসা ও উৎপাদন ক্ষেত্রে ঋণ দান করে বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশে বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। উৎপাদন বৃদ্ধি উন্নয়নের অন্যতম নির্দেশক।

৩. বিনিময় বিল বাট্টা করা, বিনিময় বিলে স্বীকৃতি প্রদান এবং বিনিময়ের বিভিন্ন মাধ্যম সৃষ্টি করে বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবসায়িক লেনদেন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করে। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য গতিশীল হয়। এ অবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক।

৪. বাণিজ্যিক ব্যাংক শিল্পের চলতি মূলধনের চাহিদার অনেকটা পূরণ করে। এর মাধ্যমে এ ব্যাংক শিল্পোন্নয়নে সহায়তা করে।

৫. বাণিজ্যিক ব্যাংক ভোগ্য ঋণ প্রদানের মাধ্যমে জনসাধারণকে বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য ক্রয়ে সহায়তা করে। ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় যা উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক।

৬. সাম্প্রতিককালে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ব্যক্তিগত জামানতের বিপরীতে রিক্সা ও ভ্যান ক্রয়, মুদিখানার দোকান খোলা, চাল-আটা ভাঙ্গানোর মিল প্রভৃতি স্থাপনের জন্যে ঋণ প্রদান করছে। এর ফলে বেকার লোকদের কর্মসংস্থান হচ্ছে ও তাদের আয় বাড়ছে।

ফলাফল: বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদনে সহায়তা করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে।

কাজ: ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনার ধারাবাহিক কার্যক্রমের একটি তালিকা প্রস্তুত করো। ◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৯

কাজের উদ্দেশ্য: কোনো হিসাব খোলা ও পরিচালনার ধারাবাহিক কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

বিবরণ: ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনার ধারাবাহিক কার্যক্রমের একটি তালিকা নিচে প্রস্তুত করা হলো:

১. **ব্যাংক হিসাব খোলার নিয়ম:** বাণিজ্যিক ব্যাংকে সাধারণত তিন ধরনের হিসাব খোলা যায়; যথা- চলতি, সঞ্চয়ী ও স্থায়ী হিসাব। ধরা যাক, মি. X তার নিজের শহরে Z নামক একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখায় একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে ইচ্ছুক। প্রথমে মি. X কে উল্লিখিত ব্যাংক শাখা থেকে হিসাব খোলার একটি আবেদনপত্র সংগ্রহ করে তাতে প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ লিপিবদ্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে, আবেদনকারীকে শনাক্ত করার জন্যে আবেদনপত্রে এমন একজন ব্যক্তির স্বাক্ষর নিতে হবে যার এ ব্যাংকে একটি হিসাব আছে। পূরণকৃত আবেদনপত্রের সাথে আবেদনকারীর ২টি পাসপোর্ট আকৃতির সত্যায়িত ছবি দিতে হবে। হিসাব খোলার সময় আবেদনকারীকে ন্যূনতম ৫০০ টাকা জমা রাখতে হবে। হিসাব খোলার সাথে সাথে আবেদনকারীকে একটি হিসাব নম্বর দেয়া হয়, যে নম্বর ধরেই তিনি পরবর্তীতে ব্যাংকে টাকা জমা দিবেন এবং চেক ইস্যু করে অর্থ উত্তোলন করবেন।

২. **হিসাব পরিচালনার নিয়ম:** ব্যাংক একটি হিসাব খোলার সাথে সাথে ব্যাংক থেকে হিসাবধারী ব্যক্তিকে একটি চেক বই, একটি টাকা জমা দেওয়ার বই এবং একটি পাস বই দেওয়া হয়। টাকা জমা দেয়ার বই দিয়ে হিসাবধারী ব্যক্তি তার ইচ্ছামতো যেকোনো পরিমাণ নগদ অর্থ, চেক, ব্যাংক ড্রাফট ইত্যাদি তার হিসাব নম্বরে জমা দিতে পারবেন। হিসাবধারী ব্যক্তি ব্যাংকে জমা রাখা টাকা চেকের মাধ্যমে ব্যাংক নিয়মের ভিত্তিতে উত্তোলন করতে পারবেন। চলতি হিসাব থেকে সপ্তাহের যেকোনো দিন, যতবার প্রয়োজন টাকা তোলা যায়। সঞ্চয়ী হিসাব থেকে সপ্তাহে দু'বার এবং স্থায়ী হিসাব থেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর টাকা তোলা যায়। হিসাবধারী ব্যক্তি ইচ্ছা করলে ব্যাংকে কোন তারিখে কত টাকা জমা দিলেন, কোন কোন তারিখে টাকা তুললেন তার বিস্তারিত বিবরণ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের দ্বারা তার পাস বইতে লিপিবদ্ধ করিয়ে নিতে পারেন।

ফলাফল: এভাবে ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনা করা যায়।

কাজ: কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারে— ব্যাখ্যা করো। ◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৩

কাজের উদ্দেশ্য: অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা লাভ।

বিবরণ: কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারে। নিচে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো:

১. **ঋণ নিয়ন্ত্রণ:** বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কর্তৃক সৃষ্ট ঋণ অর্থের জোগানের অন্যতম উৎস। এজন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রয়োজনের অধিক কিংবা কম ঋণ দিলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি কিংবা মন্দা দেখা দেয়। মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দা উভয়ই অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্য দায়ী। এজন্য তা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এমনটি করতে পারে।

২. **কাগজি নোটের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে বিভিন্ন মূল্যমানের কাগজি নোট প্রচলন করে। এটি অর্থ সরবরাহের প্রধান উপাদান। দেশে যখন মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাগজি নোটের পরিমাণ হ্রাস করে। আবার, মন্দা দেখা দিলে এ নোটের পরিমাণ বাড়ায়। এভাবে অর্থের জোগান নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখে।

৩. **সুদের হার হ্রাস বৃদ্ধি:** এটিও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করার একটি পরোক্ষ পদ্ধতি। দেশে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের দাম ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। তখন ঋণের খরচ বেড়ে যায় বলে জনসাধারণ ব্যাংক থেকে কম ঋণ নেয়। ঋণের পরিমাণ কমে গেলে দামের স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। একইভাবে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের দাম অব্যাহতভাবে হ্রাস পেতে থাকলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার কমিয়ে ঋণের প্রসার ঘটায় এবং দামস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়।

৪. **বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ:** দেশের মুদ্রার বহির্মূল্য স্থিতিশীল রাখা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য বিনিময় স্থিতিশীল রাখা জরুরি। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। এ উদ্দেশ্যে এ ব্যাংক প্রয়োজনে সোনা ও বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করে।

ফলাফল: এভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারে।

কাজ: অর্থব্যবস্থার অভিভাবক হিসেবে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বাংলাদেশ ব্যাংক— ব্যাখ্যা করো।

◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৫

কাজের উদ্দেশ্য: বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা।

বিবরণ: অর্থব্যবস্থার অভিভাবক হিসেবে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো:

১. বাংলাদেশ ব্যাংক দেশে বিভিন্ন মূল্যমানের কাগজি নোট ও ধাতব মুদ্রা প্রচলনের মাধ্যমে জনগণের জন্য লেনদেনের সহজ বিনিময়ের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছে। এর ফলে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের বিনিময় ও ভোগ সহজতর হয়েছে এবং জনসাধারণের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ অবাধ, গতিশীল ও বিস্তৃত হয়েছে। ফলে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে।

২. দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ব্যাংকিং সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে এ ব্যাংক জনগণের অলস ও বিক্ষিপ্ত সঞ্চয়গুলো একত্রিত করে মূলধন গঠনে সহায়তা করছে। অধিক মূলধন গঠন অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য, কারণ তা বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে অধিক উৎপাদনে সহায়তা করে।

৩. এ ব্যাংক মুদ্রা বাজারের নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে দেশে বিনিময় বিল, শেয়ার, সরকারি ঋণপত্র ইত্যাদির জোগান প্রভাবিত করে। এর ফলে বিনিয়োগযোগ্য তহবিল সহজলভ্য হচ্ছে এবং দেশে বিনিয়োগ ও উৎপাদন বাড়ছে।

৪. দ্রুত ও অব্যাহত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে দামস্তরের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থ ও ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে দামস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সচেষ্ট। এ উদ্দেশ্যে এ ব্যাংক প্রয়োজনানুযায়ী প্রকৃত মুদ্রার জোগান সরাসরি নিয়ন্ত্রণ এবং ঋণ নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে দেশে অর্থ ও ঋণের জোগান নিয়ন্ত্রণ করছে। এর ফলে এর পক্ষে দামস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে।

৫. বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি ও শিল্পোন্নয়নে সরাসরি সম্পৃক্ত না হলেও পরোক্ষভাবে এ উন্নয়নে সামিল হচ্ছে। এ ব্যাংক কৃষি ও শিল্পে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে উদারভাবে ঋণ তহবিল সরবরাহ করে। ফলে দেশে কৃষি ও শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে।

ফলাফল: এভাবে দেখা যায়, বাংলাদেশ ব্যাংক এদেশের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

কাজ: দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি বড় অংশীদার বাণিজ্যিক ব্যাংক— ব্যাখ্যা করো। ◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৩

কাজের উদ্দেশ্য: দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন ও শিল্পায়নে অর্থসংস্থানের পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থানের বিষয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকের অবদান সম্পর্কে ধারণা।

বিবরণ: বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এখানকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি বড় অংশীদার। নিচে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো:

১. বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো জনসাধারণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে দেশে মূলধন গঠনে সাহায্য করে। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মূলধন গঠন অপরিহার্য।

২. বাংলাদেশে বড়-ছোট বিভিন্ন প্রকার উৎপাদন ও ব্যবসা ক্ষেত্রে ঋণ দান করে এ ব্যাংকগুলো দেশে বিনিয়োগ ও উৎপাদন এবং জনসাধারণের বিভিন্নমুখী চাহিদা পূরণে সহায়তা করে।

৩. এদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বিনিময় বিলের কারবার এবং বিনিময়ের বিভিন্ন মাধ্যম সৃষ্টি করে ব্যবসা-বাণিজ্য গতিশীল ও বিস্তৃত করে। এর ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিধি বাড়ে।

৪. শিল্পের কাঁচামাল ক্রয়, শ্রমিকদের মজুরি প্রদান ইত্যাদি ব্যয়ভার মেটানোর জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক শিল্প কারখানার চলতি মূলধন-চাহিদার অনেকটা পূরণ করে। তাছাড়া নতুন নতুন কোম্পানির শেয়ার কিনে এ ব্যাংক উদ্যোক্তাদেরকে পুঁজি সরবরাহ করে দেশে কলকারখানা গড়তে সাহায্য করে।

৫. বর্তমানে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি তথা কৃষি উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এ ব্যাংক কৃষি উপকরণসমূহ ক্রয়ের ক্ষেত্রে কৃষকদেরকে ঋণদান করে। ফলে কিছুটা হলেও এ ব্যাংক কৃষি উন্নয়নে সহায়তা করে।

৬. দ্রব্য ও সেবার ভোগ বাড়লে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বাড়ে; এটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম নির্দেশক। জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার উদ্দেশ্যে এ ব্যাংক জনসাধারণকে বিভিন্ন স্থায়ী ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের জন্যে ঋণ দেয়।

৭. সাম্প্রতিককালে এ ব্যাংক রিক্সা-ভ্যান ক্রয়, মুদির দোকান খোলা, চাল-ডাল-আটা ভাঙানোর মিল স্থাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জামানতের বিপরীতে ঋণ প্রদান করে। এর ফলে অনেক বেকার লোকের কর্মসংস্থান হয়।

৮. বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো দেশের স্বল্পোন্নত অঞ্চলগুলোতে শাখা খুলে সেখানে ঋণ সহজলভ্য করে তোলে। ফলে এসব এলাকায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড জোরদার এবং উন্নয়নে গতি সঞ্চারিত হয়।

ফলাফল: এভাবে দেখা যায়, বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি বড় অংশীদারে পরিণত হয়েছে।

কাজ: বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের কৃষিঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকায়ন সম্ভব— ব্যাখ্যা করো। ◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৭

কাজের উদ্দেশ্য: বাংলাদেশ কৃষি বাংকের ঋণ কার্যক্রমে কীভাবে কৃষি আধুনিক সম্ভব তার ধারণা লাভ।

বিবরণ: বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের কৃষি ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকায়ন সম্ভব। নিচে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো:

১. কৃষির আধুনিকীকরণের জন্যে কৃত্রিম সার, উচ্চ ফলনশীল বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি অপরিহার্য। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষকদেরকে স্বল্পমেয়াদি ঋণদানের মাধ্যমে এসব উপকরণ ক্রয়ে সহায়তা করতে পারে।

২. কৃষির আধুনিকায়নের জন্যে পাওয়ার টিলার, স্প্রে মেশিন, অগভীর নলকূপ, মাড়াই মেশিন ইত্যাদি বিশেষভাবে প্রয়োজন। এ ব্যাংক মধ্যমেয়াদি ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কৃষকদেরকে এসব উপকরণ ক্রয়ে সহায়তা করতে পারে।

৩. কৃষির আধুনিকায়নের জন্যে আরও প্রয়োজন ট্রাক্টর, ট্রাক, কমবাইনড, হারভেস্টার, গভীর নলকূপ ইত্যাদি ক্রয়; পানি সেচের উদ্দেশ্যে, খাল খনন, গুদামঘর ও হিমাগার নির্মাণ, মৎস্য ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন এসবের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রয়োজন। এ ব্যাংক এসব উপকরণ ক্রয়ের জন্যে কৃষকদেরকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিয়ে সাহায্য করতে পারে।

ফলাফল: এভাবে বলা যায়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের কৃষিঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকায়ক সম্ভব।

কাজ: উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডের ভূমিকা লেখো। ◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৭

কাজের উদ্দেশ্য: উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা।

বিবরণ: দেশে বিভিন্ন ধরনের কলকারখানা স্থাপন, পুরাতন কলকারখানাগুলোর সংস্কার ইত্যাদির জন্যে বিপুল মূলধনের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মূলধন ও কারিগরি পরামর্শ প্রদান করলে শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। তখন শিল্পোৎপাদিত দ্রব্যাদির পরিমাণ বাড়বে এবং শিল্পে কর্মসংস্থান হবে। বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। নিচে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো:

১. **উৎপাদন বৃদ্ধি:** বাংলাদেশে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো মূলধনের স্বল্পতা। বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ঋণ ও কারিগরি পরামর্শ প্রদান করে শিল্পোন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়তা করতে পারে।

ক. বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় দেশে শিল্পায়নের গতি দ্রুততর হলে শিল্পোৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ বাড়বে।

খ. দেশে অধিক সংখ্যায় রপ্তানিমুখী শিল্প গড়ে উঠলে রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদিরও উৎপাদন বাড়বে।

গ. কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠিত হলে কৃষিজ কাঁচামালের চাহিদা বাড়বে। তখন তার উৎপাদনও বাড়বে।

ঘ. নতুন নতুন দ্রব্যের উৎপাদন বাড়লে শিল্পের মোট উৎপাদন বাড়বে।

২. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডের সহায়তায় দেশে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া জোরদার হলে অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ক. দেশে দ্রুত শিল্পায়নের কারণে নতুন নতুন কলকারখানা স্থাপিত হবে। ফলে সেখানে কর্মসংস্থান বাড়বে।

খ. শিল্পের জন্যে কৃষিজ কাঁচামালের চাহিদা বাড়লে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজন হবে। তখন কৃষিখাতে কিছু লোকের কর্মসংস্থান হবে।

গ. শিল্পোৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ বাড়লে এ সম্পর্কিত ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। এক্ষেত্রে অনেক লোক কাজে নিয়োজিত হতে পারবে।

ঘ. শিল্পোৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়লে তার কিছু অংশ বিদেশে রপ্তানি করা যাবে। এ কাজেও কিছু লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে।

ফলাফল: এভাবে দেখা যায়, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

কাজ: সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৮

কাজের উদ্দেশ্য: সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা লাভ।

বিবরণ: সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো:

১. একমাত্র গ্রামীণ ব্যাংকই গ্রামের দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদেরকে বিনা জামানাতে ঋণ প্রদান করে।

২. এ ব্যাংক জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র মানুষদেরকে মহাজনদের শোষণ হতে রক্ষা করে। ফলে তারা একেবারে নিঃস্ব হয়ে যায় না।

৩. এ ব্যাংক গ্রামাঞ্চলের বেকার জনগোষ্ঠিকে স্বকর্মসংস্থানের উপায় অবলম্বন করে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করে। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে বেকারত্বের মাত্রা হ্রাস পায়।

৪. এ ব্যাংক দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদেরকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে তাদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ফলে তাদের সঞ্চয় বাড়ে এবং তারা কৃষিকাজকে অধিক অর্থ বিনিয়োগ করতে সক্ষম হয়।

৫. এ ব্যাংক গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত ও অবহেলিত নারীদেরকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কাজে জড়িত হতে সাহায্য করে। এর ফলে তাদের আয় বাড়ার সাথে সাথে সামাজিক মর্যাদাও বাড়ে।

৬. ঋণ প্রদানের মাধ্যমে এ ব্যাংক গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতির দ্রুত বিকাশ ঘটে এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষগুলো সেখানে কাজকর্মের সুযোগ পায়।

ফলাফল: এভাবে দেখা যায়, গ্রামীণ ব্যাংক দেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের ভাগ্য উন্নয়নে অনন্য ভূমিকা পালন করে।

কাজ: সমবায়ীদের স্বনির্ভরতা অর্জনে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৯

কাজের উদ্দেশ্য: সমবায়ীদের স্বনির্ভরতা অর্জনে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা লাভ।

বিবরণ: সমবায়ের নীতিমালার ভিত্তিতে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক গঠিত। নিচে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হলো:

১. এ ব্যাংক সমবায়ী কৃষকদেরকে বিভিন্ন কৃষি উপকরণ যেমন, বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি ক্রয় এবং ফসল নিড়ানো, কাটা, মাড়াই ইত্যাদি কাজের ব্যয় মেটানোর জন্যে স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। এ ঋণ ৬ মাসের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়। এ ঋণ সংশ্লিষ্ট কৃষকদেরকে শস্যোৎপাদনে স্বাবলম্বী করে তোলে।

২. চাষের জন্য গবাদিপশু ও হালকা কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, জমি সমতল করা, অগভীর নলকূপ স্থাপন প্রভৃতি কাজের জন্যে এ ব্যাংক সমবায়ী কৃষকদেরকে মধ্যমমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। এ ঋণ ২ বছরের জন্য দেয়া হয়।
এ ঋণ কৃষকদেরকে কৃষির স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকর করার ক্ষেত্রে স্বনির্ভর করে তোলে।

৩. জমি ও ভারী কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন ট্রাক্টর, ট্রাক্টরচালিত লাঙল ইত্যাদি ক্রয় এবং গভীর নলকূপ স্থাপন, পানি সেচের উদ্দেশ্যে খাল খনন, গুদামঘর ও হিমাগার নির্মাণ প্রভৃতি কাজের জন্য এ ব্যাংক সমবায় খামারকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। ৫ বছরের জন্য ব্যাংক সমবায় খামারকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। এ ঋণ কৃষকদেরকে কৃষির দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা কার্যকর করার ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল করে তোলে।

৪. এ ব্যাংক সমবায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত কৃষিভিত্তিক শিল্পসমূহ যেমন পাটের বস্তা ও ব্যাগ প্রস্তুতকারী শিল্প, ছোবড়া শিল্প, তাঁত শিল্প, ধান কল, গম ভাঙ্গানো কল, ইত্যাদি স্থাপনের জন্যে ঋণ প্রদান করে। এখানে অনেক লোকের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হয় এবং তারা স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে।

৫. এ ব্যাংক সমবায়ের ভিত্তিতে পরিচালিত ছোট-খাটো নির্মাণ কোম্পানিকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয়। এর ফলে এ ব্যাংক কিছুটা হলেও আবাসন সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে। এর ফলে অনেক সমবায়ী ব্যক্তি নিজেদের চেষ্টায় আবাসন সমস্যার সুরাহা করতে পারে।

৬. এসব ছাড়াও এ ব্যাংক সমবায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত ও পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্প যেমন মাছ চাষ, পশু পালন, উৎপাদিত কৃষিপণ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি কাজের জন্য বিভিন্ন মেয়াদি ঋণ প্রদান করে। এসব কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ নিজেদের স্বাবলম্বী তোলে।

ফলাফল: এভাবে দেখা যায়, সমবায়ীদের স্বনির্ভরতা অর্জনে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অষ্টম অধ্যায় ▶ বাংলাদেশের অর্থনীতি

কাজ: বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আরও গতিশীল করতে, আর কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়? ◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০৭

কাজের উদ্দেশ্য: অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আরও গতিশীল করতে, যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার সে সম্পর্কে ধারণা লাভ।

বিবরণ: বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আরও গতিশীল করতে আর যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সেগুলো নিম্নরূপ:

১. **প্রযুক্তিগত উন্নয়ন:** দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে উৎপাদন ক্ষেত্রে উন্নততর ও টেকসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটাতে হবে।

২. **বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন:** সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার, একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিরোধ এবং উপকরণসমূহের গতিশীলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দেশে সুসংগঠিত ও অবাধ বাজার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

৩. **দক্ষ ও শিক্ষিত উদ্যোক্তা শ্রেণি সৃষ্টি:** সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, পরামর্শ, প্রশিক্ষণ ও ঋণ সুবিধার মাধ্যমে দেশে এমন এক শ্রেণির দক্ষ ও শিক্ষিত উদ্যোক্তা শ্রেণি গড়ে তুলতে হবে, যারা স্ব-উদ্যোগে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড শুরু করতে পারে।

৪. **উন্নয়নের অনুকূলে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন:** অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমাজের আপামর জনগণের সম্পৃক্ততার জন্যে প্রচার-প্রোরোচনার মাধ্যমে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ উন্নয়নের অনুকূল করতে হবে।

৫. **দুর্যোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ:** প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যাতে জানমালের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি না ঘটে সেজন্য পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগুলো জোরদার করতে হবে।

৬. **সুশাসন প্রতিষ্ঠা:** উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাধাহীনভাবে পরিচালনার জন্যে প্রকৃত গণতান্ত্রিক পরিবেশ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক দক্ষ শাসন ব্যবস্থা ও আইনের শাসন কায়েম করতে হবে।

৭. **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায়:** রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, ধর্মঘট, হরতাল, জ্বালাও-পোড়াও ইত্যাদি যাতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত করতে না পারে সেজন্যে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে হবে।

ফলাফল: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে অধিক গতিশীল করার জন্য উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যায়।

কাজ: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি খাতের গুরুত্ব অপরিসীম— ব্যাখ্যা করো। ◄ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০৯

কাজের উদ্দেশ্য: অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির খাতের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ।

বিবরণ: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো:

১. **প্রধান পেশা:** জীবিকা অর্জনের জন্য বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। জীবনধারণের জন্য এতো অধিক লোকের কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা এদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্বই প্রমাণ করে।

২. **খাদ্যের জোগান:** এ দেশে কৃষি খাতের উৎপাদিত বিভিন্ন খাদ্যশস্য এবং মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, প্রভৃতি জনগণের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করে। কৃষি উৎপাদন বাড়লে জনগণের জন্যে অধিক খাদ্যের জোগান দেওয়া এবং খাদ্য ঘাটতি দূর করা সম্ভব হবে।

৩. **শিল্পের কাঁচামালের জোগান:** আমাদের পাট, চিনি, চামড়া, চা, সিগারেট প্রভৃতি শিল্পের কাঁচামালের জোগান মূলত কৃষি থেকে আসে। কৃষিজ কাঁচামালের জোগান বাড়লে কম খরচে তা সংগ্রহ করে শিল্পোৎপাদনের ব্যয় কমানো যাবে।

৪. **কৃষি সহায়ক শিল্প স্থাপনে সহায়তা:** কৃষির উন্নতির সাথে সাথে কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার, কীটনাশক, গভীর ও অগভীর নলকূপ, পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর ইত্যাদি কৃষি উপকরণের চাহিদা বাড়বে। তখন এসব উপকরণ উৎপাদনের জন্যে দেশে কৃষি সহায়ক কলকারখানা গড়ে উঠবে।

৫. **বস্ত্রের সংস্থান:** পাট, তুলা, রেশম, ভেড়ার লোম ইত্যাদি আঁশ জাতীয় কৃষিজ পণ্য থেকে বিভিন্ন ধরনের কাপড় উৎপাদন করা হয়। কৃষি উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে এ ধরনের কাপড়ের উৎপাদন বাড়লে দেশের লোকদের বস্ত্রের চাহিদা অনেকটা পূরণ হবে।

৬. **বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা:** কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষিজাত পণ্যসমূহ অধিক পরিমাণ রপ্তানি করতে পারলে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে শিল্পের কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি করা যাবে।

ফলাফল: এসব ছাড়াও বাসস্থান, জ্বালানি ও ওষুধের উপকরণ সরবরাহ, শিল্পজাত দ্রব্যাদির বাজার সৃষ্টি, সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও কৃষি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম।

কাজ: সার্বিক শিল্প খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে আমাদের দেশের দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব— ব্যাখ্যা করো। ◄ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১২

কাজের উদ্দেশ্য: সার্বিক শিল্প খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন সম্পর্কে জানা।

বিবরণ: দ্রুত শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। তবে শিল্প খাতের উন্নয়নের জন্য সার্বিক শিল্প খাত তথা খনিজ ও খনন, শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং), বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি এবং নির্মাণ খাতের উন্নয়ন প্রয়োজন। নিচে সার্বিক শিল্প খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে দ্রুত উন্নয়ন সম্ভাবনার বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো:

১. **খনিজ- ও খনন খাতের উন্নয়ন:** খনিজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত করে। তাই দ্রুত শিল্পোন্নয়নের স্বার্থে বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস, অপরিশোধিত তেল, কয়লা, চুনাপাথর, চীনামাটি, গন্ধক, কঠিন শিলা, সিলিকা বালু, তামা ইত্যাদির সুষ্ঠু অনুসন্ধান, আহরণ ও ব্যবহার আবশ্যক।

২. **শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং):** শিল্পোৎপাদনের বিপুল বৃদ্ধি উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে। উৎপাদন বৃদ্ধি মূলত বৃহৎ শিল্পোৎপাদনের ওপর নির্ভর করে। বাংলাদেশে পাট, বস্ত্র, চিনি, সার, সিমেন্ট, জাহাজ নির্মাণ, কাগজ প্রভৃতি বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। দ্রুত উন্নয়নের জন্য এগুলোর তাই উন্নয়ন ও উৎপাদন বাড়ানো দরকার। ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠা, অধিক শিল্প ঋণ প্রদান, বেশি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, বিদেশি পুঁজি আকৃষ্ট করা, কর-রেয়াত প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বৃহৎ শিল্পের দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব। মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ও শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্যক হয় বলে এগুলোরও উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রয়োজন।

৩. **বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি:** এগুলোও আমাদের শিল্পের অংশ। তাই দ্রুত শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের এ তিন খাতেরও উন্নয়ন আবশ্যক। দেশে ইতোমধ্যে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লার সাহায্যে অধিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রাকৃতিক গ্যাস বিভিন্ন শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের ওপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

৪. **নির্মাণ:** দ্রুত শিল্পোন্নয়নের জন্যে রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট, বন্দর, আবাসিক ও বাণিজ্যিক ঘর-বাড়ি নির্মাণ অত্যন্ত জরুরি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এখাতে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

ফলাফল: সুতরাং বলা যায়, সার্বিক শিল্প খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে আমাদের দেশের দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব।

কাজ: বাংলাদেশের সেবা খাতের উন্নয়নে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় বলে তুমি মনে কর। ◄ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৪

কাজের উদ্দেশ্য: সেবা খাতের উন্নয়নে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া দরকার সে সম্পর্কে জানা।

বিবরণ: বাংলাদেশের সেবা খাত উন্নত নয়। দেশে অর্থবহ উন্নয়ন ঘটাতে হলে এ খাতেরও উন্নয়ন প্রয়োজন। এ দেশের সেবা খাতের উন্নয়নের জন্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা প্রয়োজন:

১. **শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা:** সেবা মানুষের কাছ থেকেই পাওয়া যায়। কাজেই উত্তম সেবা পেতে হলে সেবা প্রদানকারী ব্যক্তির শিক্ষা-দীক্ষা, মনমানসিকতা, নৈতিক মনোবল, কর্তব্যনিষ্ঠা, কর্মনৈপুণ্য ইত্যাদি উত্তম হওয়া প্রয়োজন। তাই বাংলাদেশে সেবা খাতের উন্নয়নের জন্যে সর্বাগ্রে এদেশের সকল মানুষের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার।

২. **সুস্থ-সবল মানব সম্পদ সৃষ্টি:** যেকোনো সেবাদানকারী ব্যক্তির সুস্থ সবল হওয়া একান্ত দরকার। সুষম খাদ্য, স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, সুচিকিৎসা ইত্যাদি মানুষকে সুস্থ ও সবল রাখে এবং তাকে কর্মক্ষম করে তোলে। তাই এদেশে সেবা খাতের উন্নয়নের জন্যে উন্নত চিকিৎসা, মানসম্মত খাবার, চিত্তবিনোদনের সুযোগ ইত্যাদি সহজে প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা দরকার।

৩. **জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি:** দরিদ্র মানুষ সকল ভালো জিনিস থেকে বঞ্চিত থাকে। এ জন্য সে সুস্থ-সবল ও কর্মোক্ষম মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য যেসব দ্রব্য ও সেবা ভোগের প্রয়োজন পড়ে সেগুলো সংগ্রহ ও ভোগ করতে পারে না। তবে তার ক্রয়ক্ষমতা বাড়লে সে ঐসব দ্রব্য ও সেবা সহজেই পেতে পারে। এদেশে তাই সেবার মান উন্নত করতে হলে এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে হবে।

ফলাফল: উপরিউক্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এদেশের সেবা খাতের উন্নয়ন ঘটবে।

কাজ: স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণের সাহায্যে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অবদান প্রদর্শন করো। ◄ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৫

কাজের উদ্দেশ্য: স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণের সাহায্যে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অবদান সম্পর্কে ধারণা লাভ।

বিবরণ: বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণসমূহ হলো: পাট, পাট খড়ি, নারকেলের ছোবড়া, বাঁশ, বেত, খড়, শন, কাঠ, গোবর, সার, আখের ও খেজুর রস, দুধ, ছানা ইত্যাদি। এসব উপকরণ দিয়ে অর্থনীতির প্রধান তিনটি খাত কীভাবে অবদান রাখে তা নিচে প্রদর্শন করা হলো:

ক. **কৃষিখাত:** ১. কৃষিকাজে শস্যোৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সারের প্রয়োগ আবশ্যক। এক্ষেত্রে গোবর সার হিসেবে ব্যবহার করে ফসলের পরিমাণ বাড়ানো যায়। ২. গ্রামাঞ্চলে বসতবাড়ি নির্মাণে বাঁশ, পাট খড়ি, শন, খড়, কাঠ ইত্যাদি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ৩. আখ ও খেজুর রস দিয়ে গুড় উৎপাদন করা হয়।

৪. পাকা আমের রস দিয়ে আমত্ব ও কাঁচা আম দিয়ে আচার প্রস্তুত করা হয়। ৫. দুধ, ছানা ইত্যাদি দিয়ে দই ও নানা রকম মিষ্টি তৈরি করা হয়।

খ. **শিল্প খাত:** ১. পাট দিয়ে বস্তা, ব্যাগ, দড়ি, সুতলি ইত্যাদি কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি তৈরি হয়। ২. বাঁশ, বেত ইত্যাদি দিয়ে ঝুড়ি, সৌখিন চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন করা হয়।

গ. **সেবা খাত:** ১. দুধ, ছানা ইত্যাদি দিয়ে মিষ্টি প্রস্তুতকারীরা বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি বানায়। ২. কাঠের তক্তা দিয়ে কাঠমিস্ত্রী বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র তৈরি করে। ৩. বাঁশ, খড়, শন, কাঠ দিয়ে মিস্ত্রি ঘর বানায়। ৪. শাক-সবজি, মাছ, মাংস, চাল, ডাল ইত্যাদি দ্বারা হোটেলওয়ালা লোকজনকে প্রস্তুতকৃত খাদ্য পরিবেশন করে।

কাজ: কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত কর। ◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৬

কাজের উদ্দেশ্য: কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রেসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ।

বিবরণ: বাংলাদেশে কৃষি ও শিল্প পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। নিচে এ দেশে কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক নির্ভরশীরতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হলো:

১. **শিল্পের, কৃষির ওপর নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রসমূহ:** বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য বৃহৎ শিল্প যেমন- পাট, চা, চামড়া, চিনি, কাগজ, হার্ডবোর্ড, পার্টিকেল বোর্ড ইত্যাদি শিল্প, তাদের প্রধান কাঁচামালের জন্যে সরাসরি কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষিজ কাঁচামালের প্রাপ্তির ওপর ভিত্তি করে তাদের স্থানীয়করণও ঘটেছে। এদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলোর বেশির ভাগেরই ভিত্তি হলো কৃষি। কৃষি খাতে উৎপাদিত পাট, পাট খড়ি, বাঁশ, বেত, চামড়া, নারকেলের ছোবড়া, এসব শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কৃষিজ কাঁচামালের দাম কমলে কৃষিভিত্তিক শিল্পগুলোর উৎপাদন ব্যয় কমে, উৎপাদন ও আয় বাড়ে; ফলে তাদের প্রসার ঘটে এবং ত্বরিৎ উন্নয়ন হয়।

২. **কৃষির, শিল্পের ওপর নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রসমূহ:** বাংলাদেশের কৃষিকাজে যেসব উপকরণ ব্যবহৃত হয় তার বেশির ভাগই শিল্পোৎপাদিত দ্রব্য। ট্রাক্টর, ট্রাক্টর-বাহিত লাঙল, পাওয়ার টিলার, উইডার, হারভেস্টার, স্প্রে মেশিন, সেচ যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক সার, কীটনাশক প্রভৃতি কৃষিকাজের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণগুলোর অন্যতম। এসবই শিল্পোৎপাদিত দ্রব্য। কৃষকরা এগুলো সহজে ও কম দামে পেলে তা কৃষিকাজে প্রয়োজনমাফিক ব্যবহার করে তাদের উৎপাদন ও আয় বাড়াতে পারবে। এছাড়া কৃষি উৎপাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ তথা বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক সারও শিল্পোৎপাদিত পণ্য। উপরন্তু এদেশের কৃষক সম্প্রদায় তাদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বহু ভোগ্য পণ্যসামগ্রী শিল্প খাত থেকেই পেয়ে থাকে। এসব শিল্পোৎপাদিত পণ্যের দাম কমলে তাদের জীবনযাত্রার মান বাড়ে।

শ্রেণির কাজ

নবম অধ্যায় ▶ বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ

কাজ: প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করো। ◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২০

কাজের উদ্দেশ্য: প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে জানা।

বিবরণ: অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমার্থক মনে হলেও ধারণা দুটির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ:

১. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে কোনো দেশের জাতীয় উৎপাদন ও মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের চলমান বৃদ্ধিকে বোঝায়। অন্যদিকে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কেবল বর্ধিত উৎপাদনকে বোঝায় না, বরং সে সঙ্গে যে কলাকৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার আওতায় তা উৎপাদিত ও বণ্টিত হয় তার উন্নততর পরিবর্তনকেও বোঝায়।

২. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কেবল উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি নির্দেশ করে। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ঊর্ধ্বমুখী পরিবর্তন ঘটে।

৩. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি একটি পরিমাণগত ধারণা যা উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার পরিমাণের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাণগত ও গুণগত ধারণার সমন্বয়কে বোঝায় যা উৎপাদনের পরিমাণ এবং উৎপাদন সহায়ক সকল বিষয়ের গুণগত পরিবর্তন নির্দেশ করে।

৪. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধারণাটি স্বল্পমেয়াদি অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময় যেমন, এক বছরের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারণাটি দীর্ঘমেয়াদের প্রেক্ষিতে বিবেচিত হয়।

৫. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া প্রবৃদ্ধি সম্ভব। কিন্তু প্রবৃদ্ধি ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে উন্নয়নের স্তরে পৌঁছানো যায়। সুতরাং প্রবৃদ্ধি হলো উন্নয়নের একটি অংশ।

কাজ: উন্নত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যের একটি তালিকা তৈরি করো। ◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২১

কাজের উদ্দেশ্য: উন্নত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যের সম্পর্কে জ্ঞান লাভ।

বিবরণ: বিশ্বের সব উন্নত দেশের উন্নয়নের স্তর একই রকম না হলেও তাদের মধ্যে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়; বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১. ভূমিসহ সকল প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার,
২. সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের উচ্চ হার,
৩. দক্ষ জনশক্তি,
৪. সম্পদশালী ও অভিজ্ঞ উদ্যোক্তা শ্রেণি;
৫. উৎপাদনক্ষেত্রে সর্বাধুনিক কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োগ,
৬. শিক্ষার ব্যাপক প্রসার,
৭. উন্নত পরিবহণ, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা,
৮. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা,
৯. অধিক মাথাপিছু আয় ও উচ্চ জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি।

কাজ: বাংলাদেশের অর্থনীতি কোন ধরনের, নির্ধারণ করো। ◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৩

কাজের উদ্দেশ্য: বাংলাদেশের অর্থনীতির ধরন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

বিবরণ: বাংলাদেশ একটি কৃষি নির্ভর ও জনবহুল দেশ। দেশটিতে একটি অনুন্নত দেশের কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তথা অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা, স্বল্প মাথাপিছু আয়, জনাধিক্য, মূলধনের স্বল্পতা, শিল্পে অনগ্রসরতা, বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি, দক্ষ জনশক্তির অভাব ইত্যাদি বিদ্যমান। অর্থনীতির এসব বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশকে একটি অনুন্নত দেশের পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা যায়।

তবে, সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান কমে আসলেও শিল্প খাতের অবদান ক্রমেই বাড়ছে। খাদ্যোৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান ধীরে হলেও বাড়ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামোর লক্ষণীয় উন্নতি ঘটছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। সর্বোপরি পর পর কয়েকটি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে দেশে পরিকল্পিতভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংগঠিত হচ্ছে। এর ফলে অর্থনীতি গতিশীল হয়েছে।

ফলাফল: এসব বিবেচনায় বাংলাদেশকে একটি অনুন্নত দেশ না বলে একটি উন্নয়নশীল দেশ বলা অধিক যুক্তযুক্ত।

কাজ: বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়সমূহের একটি তালিকা তৈরি করো। ◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১২৫

কাজের উদ্দেশ্য: বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়সমূহে সম্পর্কে জানা।

বিবরণ: বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বিভিন্ন অন্তরায় রয়েছে; সেগুলো নিম্নরূপ:

১. কৃষি নির্ভর অর্থনীতি হওয়া সত্ত্বেও কৃষির নিম্ন উৎপাদনশীলতা,
২. কৃষি উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তির সীমিত ব্যবহার,
৩. সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের নিম্ন হার,
৪. বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের অভাব,

৫. দক্ষ, অভিজ্ঞ ও ঝুঁকিবহনে আগ্রহী ও সক্ষম এমন উদ্যোক্তা শ্রেণির অভাব,
৬. অতিরিক্ত জনসংখ্যা এবং তদসম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা,
৭. ব্যাপক দারিদ্র্য
৮. কর্মমুখী, শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তির অভাব,
৯. অনিশ্চিত ও শর্তযুক্ত বৈদেশিক সাহায্য,
১০. অসংগঠিত ও অনিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থা,
১১. প্রশাসনিক দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি,
১২. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ইত্যাদি।

দশম অধ্যায় ▶ বাংলাদেশ সরকারের অর্থব্যবস্থা

কাজ: বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করো। ◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪০

কাজের উদ্দেশ্য: বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসগুলো সম্পর্কে জানা।

বিবরণ: বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসভিত্তিক তালিকা নিম্নরূপ:

কর রাজস্বের উৎসসমূহ	কর-বহির্ভূত রাজস্বের উৎসসমূহ
১. আয়কর ও মুনাফার ওপর কর	১. লভ্যাংশ ও মুনফা
২. মূল্য সংযোজন কর	২. সুদ
৩. আমদানি শুল্ক	৩. প্রশাসনিক ফি
৪. আবগারি শুল্ক	৪. জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ
৫. সম্পূরক শুল্ক	৫. অর্থনৈতিক সেবা
৬. অন্যান্য কর ও শুল্ক (যেমন: সম্পত্তি কর, বিদেশ ভ্রমণ কর, প্রমোদ কর ইত্যাদি)	৬. ভাড়া ও ইজারা
৭. মাদক শুল্ক	৭. টোল ও লেভি
৮. যানবাহন কর	৮. অ-বাণিজ্যিক বিক্রয়
৯. ভূমি রাজস্ব	৯. রেলওয়ে
১০. নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প।	১০. ডাক বিভাগ।

কাজ: বাংলাদেশ সরকারের আয় বৃদ্ধির উপায় চিহ্নিত করো। ◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪০

কাজের উদ্দেশ্য: বাংলাদেশ সরকারের আয় বৃদ্ধির উপায়গুলো সম্পর্কে জানা।

বিবরণ: বাংলাদেশ সরকারের আয় বৃদ্ধির উপায়সমূহ নিম্নরূপ:
১. কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা রোধ,
২. আয়কর ও সম্পত্তি করের হার বৃদ্ধি
৩. গ্রামের ধনী লোকদেরকে আয় করের আওতায় আনয়ন,
৪. বিলাসজাত দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন ও বিক্রয়ের ওপর উচ্চ হারে করারোপ,
৫. প্রবাসীদের অর্জিত আয়ের ওপর ক্রমবর্ধমান হারে আয় কর আরোপ,
৬. আপ্যায়নের ওপর অধিক হারে করারোপ
৭. কর বিভাগ দক্ষ ও সৎ কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদি।

কাজ: বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতওয়ারী অর্থ বরাদ্দের তালিকা তৈরি করো। ◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪৪

কাজের উদ্দেশ্য: বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতওয়ারী অর্থ বরাদ্দের সম্পর্কে ধারণা লাভ।

বিবরণ: বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতওয়ারী অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার তালিকা নিম্নরূপ:
১. শিক্ষা ও প্রযুক্তি, ২. প্রতিরক্ষা, ৩. জনপ্রশাসন, ৪. জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ৫. কৃষি, কৃষিভিত্তিক শিল্প ও গবেষণা ৬. জনস্বাস্থ্য ৭. সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ ৮. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ৯. পরিবহণ ও যোগাযোগ ১০. দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান ১১. ঋণ ও সুদ পরিশোধ ১২. শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবাসমূহ ১৩. পরিবেশ ও বন ১৪. বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম ১৫. স্থানীয় সরকার ও পল্লি উন্নয়ন।
এসব খাত ছাড়াও বাংলাদেশ সরকার আরও কয়েকটি খাতে ব্যয় বরাদ্দ করে। এগুলো হলো: মহিলা ও শিশু, পানি সম্পদ, মৎস্য ও পশুসম্পদ, গৃহায়ণ, খাদ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

কাজ: সাম্প্রতিক কালে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ করো। ◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪৪

কাজের উদ্দেশ্য: সাম্প্রতিক কালে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে জানা।

বিবরণ: সাম্প্রতিক কালে নানা কারণে সরকারের ব্যয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। নিচে কারণগুলো বিশ্লেষণ করা হলো:
প্রথমত, উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ, বন্দর নির্মাণ, সেচ সুবিধার প্রসার, পানি সম্পদ উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারের ব্যয় পূর্বাপেক্ষা অনেক বেড়েছে।
দ্বিতীয়ত, অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিনামূল্যে বা হ্রাসকৃত মূল্যে খাদ্য, চিকিৎসা ও শিক্ষা সুবিধা এবং বিশেষ শ্রেণির সমন্বয় সম্বলহীন মানুষদের জন্যে বিভিন্ন প্রকার ভাতা প্রদান ইত্যাদি কারণে সরকারি ব্যয় বাড়ছে।
তৃতীয়ত, উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড বাড়ার সাথে সাথে অভ্যন্তরীণ সার্বিক প্রশাসনের পরিধি অনেক বেড়ে যাওয়ায় এক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় বাড়ছে।
চতুর্থত, অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিয়োগ ও পরিচালনার জন্য ব্যয় ক্রমশই বাড়ছে।
পঞ্চমত, প্রতিরক্ষার জন্য আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জামাদি ক্রয় ও সংরক্ষণ এবং সেনাবাহিনীর বেতন, ভাতা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির জন্য ব্যয় বাড়ায় সরকারি ব্যয়ও বাড়ছে।
ষষ্ঠত, কৃষকদেরকে স্বল্পমূল্যে কিছু প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ সরবরাহের জন্য ভর্তুকি বাড়ায় সরকারি ব্যয়ও বাড়ছে।
সপ্তমত, দেশে নগরায়ণ প্রক্রিয়া জোরদার হওয়ায় প্রথাগত সরকারি ব্যয় বাড়ছে।
অষ্টমত, সাম্প্রতিককালে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাড়ায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্যে সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে।
এসব ছাড়াও আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস, নির্বাচন অনুষ্ঠান ইত্যাদি কাজেও সরকারি ব্যয় বাড়ছে।

ফলাফল: সুতরাং বলা যায়, সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন কারণে সরকারি ব্যয় বাড়ছে।

কাজ: উদ্বৃত্ত বাজেট ও ঘাটতি বাজেটের পার্থক্য নির্ণয় করো। ◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪৬

কাজের উদ্দেশ্য: বাজেটের পার্থক্য সম্পর্কে জানা।

বিবরণ: উদ্বৃত্ত বাজেট ও ঘাটতি বাজেটের মধ্যে পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ:
১. **সংজ্ঞাভিত্তিক পার্থক্য:** কোনো নির্দিষ্ট বছরে প্রত্যাশিত রাজস্ব ব্যয়ের তুলনায় যদি প্রত্যাশিত আয় বেশি হয় তাহলে তাকে উদ্বৃত্ত বাজেট বলে। কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যাশিত রাজস্বের তুলনায় যদি প্রত্যাশিত ব্যয় বেশি হয়ে পড়ে তাহলে তাকে ঘাটতি বাজেট বলে।
২. **সূত্রভিত্তিক পার্থক্য:** উদ্বৃত্ত বাজেট = (মোট রাজস্ব আয়—মোট রাজস্ব ব্যয়) > 0
বা $B_s = (TR-TE) > 0$
যেখানে, B_s= উদ্বৃত্ত বাজেট, TR = মোট রাজস্ব আয় এবং TE= মোট রাজস্ব ব্যয়; আর ঘাটতি বাজেট = (মোট রাজস্ব আয়— মোট রাজস্ব ব্যয়) < ০
বা $B_D = (TR-TE) < 0$
যেখানে B_D = ঘাটতি বাজেট; TR= মোট রাজস্ব আয় ও TE = মোট রাজস্ব ব্যয়।
৩. **পদ্ধতি পার্থক্য:** সরকারি ব্যয়, কর হস্তান্তর ব্যয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ দুই বাজেটে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়:
উদ্বৃত্ত বাজেটের ক্ষেত্রে: কর রাজস্ব বৃদ্ধি > সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি এবং ঘাটতি বাজেটের ক্ষেত্রে: সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি > কর রাজস্ব বৃদ্ধি।
৪. **ফলাফলের ভিত্তিতে পার্থক্য:**
i. উদ্বৃত্ত বাজেট মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় না; কিন্তু ঘাটতি বাজেট দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।
ii. উদ্বৃত্ত বাজেট আয় ও নিয়োগ বাড়ায়; কিন্তু ঘাটতি বাজেট তা বাড়ায় না।

iii. উদ্বৃত্ত বাজেট বেকারত্ব দূর করে না বরং তা বাড়ায়; কিন্তু ঘাটতি বাজেট কর্মসংস্থান বাড়ায় বলে বেকারত্ব কমাতে সাহায্য করে।

iv. উদ্বৃত্ত বাজেট উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখে না; কিন্তু ঘাটতি বাজেটের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ে।

তাই দেখা যায়, উদ্বৃত্ত বজেট ও ঘাটতি বাজেটের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ঘাটতি বাজেট যথেষ্ট সহায়ক।

কাজ: সুষম বাজেট ও অসম বাজেটের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করো। ◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪৬

কাজের উদ্দেশ্য: বাজেটের পার্থক্য সম্পর্কে জানা।

বিবরণ: সুষম বাজেট ও অসম বাজেটের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ:

১. **সংজ্ঞাভিত্তিক পার্থক্য:** যে বাজেটে সরকারের আয়-ব্যয়ের পরিমাণ সমান হয় তাকে সুষম বাজেট বলে। অন্যদিকে, যে বাজেটে সরকারের আয়-ব্যয়ের পরিমাণ সমান হয় না তাকে অসম বাজেট বলে।

২. **প্রকারভেদের ভিত্তিতে পার্থক্য:** সুষম বাজেটের কোনো প্রকারভেদ নেই; কিন্তু অসম বাজেটের তা আছে। এ বাজেট দু'প্রকার; যথা: উদ্বৃত্ত বাজেট ও ঘাটতি বাজেট।

৩. **সূত্রভিত্তিক পার্থক্য:**
সুষম বাজেট = মোট রাজস্ব আয় − মোট রাজস্ব ব্যয় = 0
বা $B_B = TR - TE = 0$ যেখানে B_B = সুষম বাজেট, TR = মোট রাজস্ব আয়, TE = মোট রাজস্ব ব্যয়
অসম বাজেট = মোট রাজস্ব আয় > মোট রাজস্ব ব্যয়
অর্থাৎ TR > TE
এবং = মোট রাজস্ব ব্যয় > মোট রাজস্ব আয়
অর্থাৎ TE > TR

৪. **ফলাফলের ভিত্তিতে পার্থক্য:**

i. সুষম বাজেট মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় না; দেশে মুদ্রাস্ফীতি থাকলে তা হ্রাসের জন্য উদ্বৃত্ত বাজেট গ্রহণ করা হয়; ঘাটতি বাজেট মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়।

ii. সুষম বাজেট দ্বারা উন্নয়নের জন্য অর্থ সংস্থান করা যায় না; কিন্তু উদ্বৃত্ত বাজেট দ্বারা তার সংস্থান করা সম্ভব।

iii. সুষম বাজেট যথেচ্ছা সরকারি আয়-ব্যয় বাড়ানো কিংবা কমানোর বিপর্যয় কাটাতে পারে। কিন্তু অসম বাজেটে তা লক্ষণীয়ভাবে বিদ্যমান থাকে।

iv. মন্দা প্রতিরোধে সুষম বাজেটের কোনো ভূমিকা নেই; কিন্তু এক্ষেত্রে ঘাটতি বাজেটে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

কাজ: বাংলাদেশ সরকারের বাজেটের কোনটি অ-উন্নয়ন এবং কোনটি উন্নয়ন বাজেটের অংশ তা নির্ণয় করো। ◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৪৯

কাজের উদ্দেশ্য: উন্নয়ন এবং অ-উন্নয়ন বাজেট সম্পর্কে জানা।

বিবরণ: বাংলাদেশ সরকারের বাজেটের কোনটি অ-উন্নয়ন এবং কোনটি উন্নয়ন বাজেটের অংশ তা নিচে নির্ণয় করা হলো—

i. অ-উন্নয়ন বাজেটের অংশ:
বাজেটের যে অংশে সরকারের দৈনন্দিন বা চিরাচরিত আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয় এবং বাজেটের ব্যয়ের খাতগুলো সরাসরি উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত নয় তাই হলো অ-উন্নয়ন বাজেট।

ii. অ-উন্নয়ন বাজেট আয়ের উৎসসমূহ:

কর থেকে আয়	কর-বহির্ভূত আয়
১. আয় ও মুনাফার ওপর কর	১. সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে লভ্যাংশ ও মুনাফা
২. মূল্য সংযোজন কর	২. সুদ থেকে প্রাপ্তি
৩. আমদানি মুল্ক	৩. প্রশাসনিক ফি
৪. আবগারি শুল্ক	৪. জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ
৫. সম্পূরক শুল্ক	৫. সেবা বাবদ প্রাপ্তি
৬. ভূমি রাজস্ব	
৭. যানবাহন কর	৬. ভাতা ও ইজারা
৮. স্ট্যাম্প বিক্রয়	৭. টোল ও লেভি
৯. মাদক শুল্ক	৮. রেলওয়ে
১০. অন্যান্য কর ও শুল্ক	৯. ডাক বিভাগ
	১০. তার ও টেলিফোন বোর্ড
	১১. অন্যান্য কর-বহির্ভূত রাজস্ব

iii. উন্নয়ন বাজেটের অংশ:
বাজেটের যে অংশে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয় তাই হলো উন্নয়নমূলক বাজেট। এ বাজেটে বাংলাদেশ সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বিস্তারিত বিবরণ ও সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ এবং অর্থ সংস্থানের উৎসের বিবরণ উল্লেখ থাকে।

উন্নয়ন বাজেটে আয়ের উৎসসমূহ	উন্নয়ন বাজেটে ব্যয়ের খাতসমূহ
অ. অভ্যন্তরীণ উৎস:	১. কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন
১. অ-উন্নয়ন বাজেটের উদ্বৃত্ত	২. স্থানীয় সরকার ও পল্লি উন্নয়ন
২. অতিরিক্ত কর ধার্যের মাধ্যমে আয়	৩. পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন
৩. অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে ঋণ	৪. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি
৪. বন্ডের মাধ্যমে ঋণ	৫. শিক্ষা ও প্রযুক্তি
আ. বৈদেশিক উৎস:	৬. পানি সম্পদ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ
১. বৈদেশিক সাহায্য	৭. গৃহায়ণ
২. বৈদেশিক ঋণ	৮. শ্রম ও জনশক্তি
	৯. মহিলা ও যুব উন্নয়ন

কাজ: বাংলাদেশের উন্নয়ন বাজেটের মূল্যায়ন সম্বন্ধে তোমার মতামত দাও। ◀ কাজ: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১৫০

কাজের উদ্দেশ্য: বাংলাদেশের উন্নয়ন বাজেটের অর্থায়ন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ।

বিবরণ: বাংলাদেশের উন্নয়ন বাজেটের অর্থায়ন সম্বন্ধে আমার মতামত নিম্নরূপ:

বাংলাদেশ সরকার প্রতি বছর উন্নয়ন বাজেটের অধীনে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য একটি বিরাট অংকের অর্থ বরাদ্দ করে। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎসগুলো থেকে এ ব্যয় সংকুলান করা হয়। তবে এক্ষেত্রে অর্থায়ন কার্যকরভাবে করা সম্ভব হয় না। এ প্রেক্ষিতে নিচে উন্নয়ন বাজেটের অর্থায়ন সম্বন্ধে আমার মতামত তুলে ধরা হলো:

প্রথমত, উন্নয়ন বাজেটের অর্থায়নের অভ্যন্তরীণ উৎসগুলোর মধ্যে অ-উন্নয়ন তথা রাজস্ব বাজেটের উদ্বৃত্তই প্রধান। তবে ব্যয়বহুল উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য রাজস্ব বাজেটের উদ্বৃত্তের পরিমাণ নিতান্তই কম হয়।

দ্বিতীয়ত, এদেশে কর এমনিতেই এক অপ্রিয় ব্যাপার। তাই জনসাধারণের ওপর বাড়তি করভার চাপিয়ে উন্নয়নের রাজস্ব সংগ্রহ করা সত্যিই দুরূহ বিষয়।

তৃতীয়ত, সরকার বাজেট ঘাটতি মেটানোর জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে ইতিমধ্যে অনেক টাকা ঋণ গ্রহণ করে ফেলেছে। এ অবস্থায় এ খাত থেকে আরও ঋণ নিয়ে উন্নয়ন বাজেটে অর্থসংস্থান করলে বেসরকারি খাতে ব্যাংক ঋণের সংকট দেখা দিতে পারে।

চতুর্থত, সরকার কর্তৃক বন্ড ছেড়ে অর্থ সংগ্রহ করাও অসুবিধাজনক। কারণ, এভাবে অর্থ সংগ্রহ করা হলে বেসরকারি খাতে মূলধনের সংকট দেখা দিতে পারে।

পঞ্চমত, উন্নয়নের জন্য দেশীয় সম্পদের অপ্রতুলতার প্রেক্ষিতে বাধ্য হয়েই সরকারকে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর অধিক নির্ভর করতে হয়। কিন্তু বৈদেশিক সাহায্যের ক্ষেত্রে রয়েছে তার কঠিন শর্তসমূহ, অনিশ্চয়তা, অপ্রতুলতা ইত্যাদি অসুবিধাসমূহ। এজন্যে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল উন্নয়ন কর্মসূচির সাফল্য অনেকটাই অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

উপরের আলোচনার আলোকে এ কথা বলা যায়, বিদ্যমান সমস্যাসংকুল অর্থায়ন পদ্ধতির প্রেক্ষিতে এদেশে রাজস্ব খাতের উদ্বৃত্তের ওপরই অধিক নির্ভর করা উচিত।

শ্রেণির কাজ